বর্তিকা

বাৎসরিক পত্রিকা
(২০২২-২৩)

২৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন
খেজুরী কলেজ
পো: বারাতলা
১লা সেপ্টেম্বর, ২০২২

খেজুরী কলেজ

॥ বারাতলা, পূর্ব মেদিনীপুর ॥

আমরা করবো জয়, নিশ্চয় .....

প্রকাশক : খেজুরী কলেজ ছাত্র সংসদ

শিক্ষার আলোক পাক সর্বজন
ছাত্র সংসদ সর্বক্ষণ

বার্ষিক পত্রিকা

বর্তিকা

খেজুরী কলেজ
ছাত্র সংসদ
২০২২ - ২০২৩

খেজুরী কলেজ পত্রিকা : **বর্তিকা (Bartika)**

প্রকাশ কাল : ১লা সেপ্টেম্বর, ২০২২

খেজুরী কলেজ, বারাতলা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৭২১৪৩১

উপদেষ্টা মণ্ডলী : ডাঃ পার্থপ্রতিম দাস, সভাপতি, পরিচালন সমিতি, খেজুরী কলেজ
ড. অসীম কুমার মান্না, অধ্যক্ষ, খেজুরী কলেজ
ড. গৌতম দন্ডপাট, আহ্বায়ক, সাংস্কৃতিক উপসমিতি, খেজুরী কলেজ
ড. কুন্তল ঠাকুর, সভাপতি, ছাত্রসংসদ, খেজুরী কলেজ
ড. স্মৃতি রাই, সহ-সভাপতি, ছাত্রসংসদ, খেজুরী কলেজ
শ্রী সমীর সিং, কোষাধ্যক্ষ, ছাত্র সংসদ, খেজুরী কলেজ
শ্রী অমিয় রঞ্জন দাস, প্রধান করণিক, খেজুরী কলেজ

পত্রিকা সম্পাদক : সঞ্জীব মণ্ডল

পত্রিকা সহ-সম্পাদক : বৈশাখী মান্না

প্রচ্ছদ : শ্রী রাজকুমার মাইতি

মুদ্রণ : মা কালী অফসেট, বাঁশগোড়া বাজার, মোঃ- ৯৭৩৪৮১০৩৫৯

খেজুরী কলেজের ছাত্রসংসদের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রনীল পাত্র, কর্তৃক প্রকাশিত।

ছাত্র সংসদ

Dr. Kuntal Thakur	–	*President*
Dr. Smriti Rai	–	*Vice-President*
Prof. Samir Sing	–	*Treasurer*
Indranil Patra	–	*G.S.*
Aparna Jana	–	*A.G.S.*
Subharaj Nayek	–	*Cultural Secretary*
Akash Das	–	*Asst. Cultural Secretary*
Papiya Mondal	–	*Asst. Girl's Common Room Secretary*
Sanchita Pradhan	–	*Girl's Common Room Secretary*
Shib Sankar Pahari	–	*Boy's Common Room Secretary*
Akhil Ali Saha	–	*Sports Secretary*
Arijit Patra	–	*Asst. Sports Secretary*
Sanjib Mondal	–	*Magazine Secretary*
Baishakhi Manna	–	*Asst. Magazine Secretary*

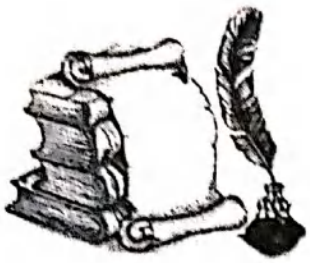

সভাপতির কলম

কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সারস্বত প্রতিভা বিকাশের অন্যতম মাধ্যম **'বর্তিকা'** প্রকাশিত হচ্ছে জেনে খুশি হলাম। শিক্ষা জ্ঞানের উন্মেষ ঘটায়। জ্ঞানের আলোক **'বর্তিকা'** প্রজ্জ্বল হোক্ এই আশা করি। সেই ২০০২ থেকেই **'বর্তিকা'** জাজ্জ্বল্যমান। অধ্যাপকগণ জ্ঞান প্রদীপের সলতে উস্‌কে দিচ্ছেন, তেল জুগিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের **'বর্তিকা'** নিরন্তর উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হোক্। সংশ্লিষ্ট সকলের শুভ কামনা করি।

ধন্যবাদান্তে —
ড. কুন্তল ঠাকুর
সভাপতি, ছাত্র সংসদ
খেজুরী কলেজ
বারাতলা, পূর্ব মেদিনীপুর

তাং- ২৩শে আগষ্ট, ২০২২
বারাতলা, পূর্ব মেদিনীপুর

অধ্যক্ষের কলম

ছাত্রসংসদের উদ্যোগে ২৪ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে **'বর্তিকা'** প্রকাশিত হচ্ছে। 'খেজুরী কলেজ' ঐতিহ্যবাহী খেজুরী জনপদের শিক্ষার্থীদের একমাত্র উচ্চ শিক্ষার আলোক **'বর্তিকা'** স্বরূপ। যদিও অনেকেরই সারস্বত প্রতিভা বিকাশের মুদ্রিতরূপ এই প্রথমবার উন্মোচিত হচ্ছে। তবুও যেহেতু তারা কলেজের ছাত্র-ছাত্রী অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষার মহাবিদ্যালয় স্তরীয় শিক্ষাঙ্গনের কুশীলব, তাই তাদের লেখায়-রেখায় ঋদ্ধতার ছাপ থাকবে আগামীদিনে এটিই কাঙ্খিত। কর্মজীবনের পড়ন্ত বেলায় তথা হলুদ বিকেলে আমাদের আগামী প্রজন্মের নাগরিক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা সারস্বত সাধনায় কৃতি হয়ে উঠুক এই প্রত্যাশা করি। **'বর্তিকা'** তারই সূতিকাগার হোক্। তাই, পাঠ্যক্রমের দৈনন্দিন লেখাপড়ার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হওয়া প্রয়োজন। আর, ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই যে তা করছে বর্তিকার প্রকাশ তারই প্রমাণ।

'বর্তিকা' প্রকাশের জন্য ছাত্র সংসদের সদস্যবৃন্দ এবং অন্যান্য সকল সহযোগীদের ধন্যবাদ জানাই।

ধন্যবাদান্তে —
ড. অসীম মান্না
অধ্যক্ষ, খেজুরী কলেজ
বারাতলা, পূর্ব মেদিনীপুর

তাং- ২৩শে আগষ্ট, ২০২২
বারাতলা, পূর্ব মেদিনীপুর

সাধারণ সম্পাদকের কলম

ঐতিহাসিক খেজুরীর উচ্চশিক্ষার প্রাণকেন্দ্র এই খেজুরী কলেজ অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই শিক্ষাবিস্তারে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। স্বাধীনতার দীর্ঘ ৫২ বৎসর পর পিছিয়ে পড়া খেজুরীর প্রত্যন্ত এলাকার বিভিন্ন গ্রামের দরিদ্র নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের এমনকি সংখ্যালঘু, তপশীল, আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম। এই অঞ্চলের বিশিষ্ট ভূমিদাতাগণের বদন্যতায় প্রথমে ব্যক্তি মালিকানা ও পরে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারী অর্থের সহায়তায় ১৯৯৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই কলেজ এলাকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের ঐকান্তিক উদ্যোগে ও কঠোর পরিশ্রমে এই কলেজ গড়ে উঠেছে। তাদের জানাই ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রণাম ও সেলাম। আমাদের প্রিয় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক পত্রিকা **"বর্তিকা"** প্রকাশিত হচ্ছে। এতে অধ্যক্ষ মহাশয়, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাগুলি প্রকাশ পাবে। এর মধ্য দিয়েই আগামী দিনে লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক হওয়ার প্রথম সোপান রচিত হওয়ার প্রচেষ্টাতে আমি গর্বিত। এছাড়াও বাৎসরিক খেলাধূলা-চর্চ্চার ছন্দ পতনের যুগেও কলেজ চিরাচরিত রীতি ধরে রেখেছে। বর্তমানে পঠন-পাঠনের ধারা পরিবর্তনশীল সব মিলিয়ে মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিকাঠামো ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও গঠনগত পরিকাঠামো আমাদের এখন ভোগাচ্ছে। স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রথম বর্ষের ভর্তির জন্য প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় মেধা তালিকা প্রকাশ করে বহুকাঙ্খিত ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা নির্দিষ্ট নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ। যার ফলে অন্যান্য কলেজের মতো খেজুরী কলেজে বর্তমান ছাত্র সংসদ ক্ষমতার অধীনে কোনো বেপরোয়া ছাত্র সংঘর্ষ বা কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা আজও ঘটেনি। তার জন্য আমি, আমরা ছাত্র সংসদ ও ছাত্র ইউনিট সদস্য সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাই।

ধন্যবাদান্তে —
ইন্দ্রনীল পাত্র
সাধারণ সম্পাদক, ছাত্র সংসদ
খেজুরী কলেজ
বারাতলা, পূর্ব মেদিনীপুর

তাং- ২৩শে আগষ্ট, ২০২২
বারাতলা, পূর্ব মেদিনীপুর

পত্রিকা সম্পাদকের কলম

কখন যে এলো, মধুর সে লগন
দিয়েছি তো সব দিয়েছে মন।
অগোচর হৃদয়ে স্মৃতি চারণ করি বার বার
সবার ভালোবাসায় হই একাকার।
কল্পনার ছন্দ নয়, ওমনের এনেক আশা —
সবার স্মৃতিচারণ হবে হৃদয়ের এ ভাষা।
নতুন আলোতে বিচ্ছিন্ন হবার নেই অবক্ষণ,
হোক ধন্য ২০২২ এর আত্মপ্রকাশ।

সাহিত্য সমাজ ভাবনার দর্পণ। সমাজের দৃষ্টি ভঙ্গির সমস্ত কিছুকে তুঙ্গে ধরতে পারে সাহিত্য। কলেজ পত্রিকা তরণ প্রতিভা বিকাশের অন্যতম সোপান। ছাত্রদের অন্তর্নিহিত সুপ্ত প্রতিভা পত্রিকার মাধ্যমে বিকশিত হয়। ছাত্ররা অন্তররুদ্ধ স্বাগত ভাষণকে কলেজ পত্রিকায় প্রকাশ করে। কলেজ স্তরে তরুন, যৌবনের অগ্রদূত ছাত্ররা নতুন বিষয় পাঠ্য গ্রহণ করে। অধীত বিদ্যার অভিজ্ঞতায় অনেক নতুন তথ্য হৃদয়ে সঞ্চিত হয়। তাদের নতুন নতুন চিন্তাভাবনা কলেজ পত্রিকাতে স্থান করে নেয়। বয়ঃসন্ধিকালের ছেলেমেয়েরা সকলের মনোযোগ ও দৃষ্টিকে আকর্ষণ করতে চায়। যৌবনের আদি মুহূর্তে আকর্ষণ প্রবনতা বাড়ে এবং উপযুক্ত মাধ্যম না পেয়ে বিকৃতি পথে তলিয়ে যায়। নবীন মানসিকতাকে সুন্দর ও সুচারুভাবে বিকশিত করানোর জন্য পত্রিকার ভূমিকা অত্যন্ত জরুরী।

সাহিত্যের আত্মপ্রকাশ লাভ কালের অতলে তলিয়ে যাওয়া সমুহ বিষয়ের পরিকাঠামোগত, বিকল্প গবেষণালব্ধ ভাষা ও সংস্কৃতি, ভাব প্রকাশের অন্তর্নিহিত প্রেরণার কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, ব্যঙ্গ কবিতা, রঙ্গ প্রবন্ধ, প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে পত্রিকাতে বিচ্ছিন্ন ভাব রাশির সুসংহত ঐক্যবদ্ধ রূপ প্রকাশিত হয়।

পত্রিকা এই নবীন ভাবনার রচনাগুলিকে আপন কক্ষে স্থান করে দেয়। ভবিষ্যতের রবীন্দ্রনাথ, নজরুল নবীন এই প্রতিভার মধ্য আত্মগোপন করে থাকে। এই পত্রিকার পরিচালনার দ্বারা সাংগঠনিক শক্তি ও সৃজনী প্রতিভার বিকাশ হয়। ছাত্রদের সৃজনী প্রতিভাকে গঠনমূলক কাজ, পাঠানুরাগে অনুপ্রাণিত করে কলেজ পত্রিকা। ছাত্ররা দিশেহারা হয়ে বিপথগামী হলে সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে। এরাই ভবিষ্যতের কবি, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার ও দেশসেবক। তাই এদের সামনে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

ছাত্রদের ভাবাবেগ ও চিন্তা শক্তিকে যথাযথভাবে প্রকাশের সুযোগ দিয়ে কলেজ পত্রিকাকে সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশের ধারক ও বাহক করে তুলতে হবে।

ধন্যবাদান্তে —
সঞ্জীব মণ্ডল
পত্রিকা সম্পাদক, ছাত্র সংসদ
খেজুরী কলেজ
বারাতলা, পূর্ব মেদিনীপুর

তাং- ২৩শে আগষ্ট, ২০২২
বারাতলা, পূর্ব মেদিনীপুর

সূচীপত্র ঃ

১।	অথচ তবুও একা	—	সৌমিত্র বেরা	— ১
	আজও খুঁজি	—	ঋত্বিকা ভট্টাচার্য্য	— ১
২।	কলেজের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা	—	দীপা মণ্ডল	— ২
৩।	ছাত্রী জীবন	—	সম্পা জানা	— ৩
৪।	শিক্ষক	—	কথামালা মাইতি	— ৪
৫।	Education Deportment	—	রুম্পা মণ্ডল	— ৫
৬।	পড়াশোনা	—	ঊর্মি মণ্ডল	— ৬
৭।	বৃষ্টি ভেজা স্মৃতি	—	সন্দীপ মণ্ডল	— ৭
৮।	Camera Lance Photograpphy	—	সুমিত পাল	— ৮
৯।	পুরোনো স্মৃতি	—	মিতালী প্রামাণিক	— ৯
১০।	আসক্ত মন	—	মৌসুমী মাকুড়	— ১০
	নিত্যতা	—	জয়দেব মাইতি	— ১০
	অপেক্ষায় আছি	—	সন্দীপ মণ্ডল	— ১০
১১।	মা	—	প্রিয়াঙ্কা সাহু	— ১১
১২।	হঠাৎ ভেঙে গেল স্বপ্ন	—	মালতী দাস	— ১২
	মৃত্যুর পরে	—	অমিত কুমার পণ্ডা	— ১২
	উদাস	—	কৃষ্ণকান্ত দাস	— ১২
১৩।	স্বীকারোক্তি	—	প্রাণকৃষ্ণ দাস	— ১৩
১৪।	বই	—	চৈতালী গিরি	— ১৫
	সমাজ বন্ধু	—	কৃষ্ণা মিদ্যা	— ১৫
১৫।	ভ্যাবলার পাকা দেখা	—	বিধান দাস	— ১৬
১৬।	করোনা ভাইরাস	—	রুমারাণী মণ্ডল	— ১৭
	প্রকৃতি	—	সুভাষ মায়া	— ১৭
১৭।	আকুতি	—	আদিত্য প্রামাণিক	— ১৮
১৮।	রবীন্দ্রনাথের মানসী - প্রকৃতি ভাবনা ও স্বদেশ চেতনা	—	আত্রেয়ী মাল	— ১৯
১৯।	প্রিয় খেজুরী মহাবিদ্যালয়	—	অনিতা মাইতি	— ২১
২০।	স্বপ্নের দেশ	—	সূর্যশেখর পাত্র	— ২২
	বিরক্ত বর্ষা	—	সুতপা পাত্র	— ২২
২১।	আজকের সমাজ	—	দিলীপ কুমার দাস	— ২৩
২২।	শরৎ	—	সুশীল বেরা	— ২৫
২৩।	বাংলা	—	সুশান্ত মণ্ডল	— ২৫
২৪।	গোধূলী লগ্ন	—	নৈর্মিষা প্রামাণিক	— ২৬
	জাগতিক	—	মধুমিতা মণ্ডল	— ২৬
২৫।	মতি	—	মধুমিতা মণ্ডল	— ২৭
২৬।	মা মানে তো	—	শুভ্রা জানা	— ২৮
২৭।	ভাবনা	—	শোভনা দাস	— ২৯
২৮।	Best Friend	—	সঞ্চিতা বেরা	— ৩০
২৯।	ভাবনার বৃত্ত	—	বিমল মণ্ডল	— ৩২

"অথচ, তবুও একা"

— সৌমিত্র বেরা, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

অমরাবতীর কৃষ্ণচূড়ায়,
রাজও দুটো নাম
সেই একই ভাবে শুকতারা হয়ে
স্মৃতি আটকে সাক্ষী,
হৃদয় নিঙড়ানো কত আবেগী সংলাপ
মনে পড়ে।।
অথচ.....
সবুজ পাতার কিশলয়ে
ভালোবাসার ক্লোরোফিলে শ্বাস নিয়েছিলে
তুমি,
লজ্জিত পুলকে আমার ললাটে
এঁকেছিলে জীবনের জয়টিকা
তবুও....
চিঠির ডানায় ধূসর চোখ,
কৃষ্ণা দ্বাদশীর চন্দ্রালোকে
খুঁজি নহবতের,
সবুজ ভোরের আলোকে।
আর উষ্ণতার আস্বাদে নামে অন্ধকার।
চোখের নীচে আ-খোলা চিঠি,
স্তব্ধতায় নিবিড় মায়াবী রাত।
উদাসীন প্রেমের ঐকান্তিক সুখী সংলাপে
রাত হয় নিবিড় নিবিড়তার।
স্মৃতি সত্তায় আঁচড় কাটি অমাবস্যার রাতে
জোনাকির আলোর মতো।
আমি, আমি একা।

.....

"আজও খুঁজি"

— ঋত্বিকা ভট্টাচার্য্য, প্রাক্তন ছাত্রী

আজও তোমাকে খুঁজি চিত্রে ভাস্কর্যে লোকায়ত পটে
খুঁজি নিজস্ব কল্পনায়, ধূলোয় ধূসর জনহীন প্রান্তরে,
পাহাড়ে পর্বতে নয়, খুঁজি মন্দিরে মসজিদে, গীর্জায়,
কখনো বা ভূষণ ডাঙ্গায় উদাসে আপন আলয়ে।
আমরা আজ নিসঙ্গ, অধর্ম অন্ধকার মৃন্ময় মাঝে
মন্ত্রহীণ সাধনাহীন মরুপ্রান্তে বহ্নিমান আকাশে।
তুমি তো জানো
কেন খুঁজি এই বিশ্বমাঝারে,
এই তপ্তরিক্ত হাহাকারে দাউ দাউ গ্রীষ্মে দুপুরে
নির্ঝরের কামনা বাসনার পাশে,
কেন খুঁজি নীলিমায় সকরুন হৃদয়ের কান্নায়?
তুমি তো জানো কেন এই ছিন্ন ভিন্ন দিন
অসীম আকাশে বহ্নিমান সূর্যরশ্মি।
কেন অন্ধকার অন্যায় অবিচারের সাথে পাপের জলন্ত চাবুক?
মাটি স্পর্শ করো শোনো দুঃখী জন্মভূমি।

.....

কলেজের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা

— দীপা মণ্ডল

"আজ আমি খুব খুশি কারণ এই করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও আমার কলেজ খুলছে।" তার উপর আজ আমার কলেজে প্রথম দিন আমার। সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি কলেজে যাবার জন্য রেডি হলাম। এবার আমার মধ্যে ভয় কাজ করছে একটু একটু করে। একটু বললে ভুল বলা হবে কারণ, আমার মধ্যে তো অনেক বেশি ভয় কাজ করছে। আমি ভাবলাম আমিতো সেখানে কোনো মানুষকে চিনি না, জানিনা, আমি কী তাদের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবো? এই সব কিছু ভাবতে ভাবতে শেষে কলেজের উদ্দেশ্যে রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঠিক ১১টার সময় আমি কলেজের গেটের সামনে এসে দাঁড়ালাম। এখানে এসেই আমার সব কিছু নতুন নতুন লাগছে। কারণ, এখানে সবাই নতুন। কিছু পুরানো বান্ধবীরাও এই কলেজে ভর্তি হয়েছে কিন্তু আমি তাদের চিনতে পারছিনা। অনেক চেষ্টা করলাম তাদের খুঁজে বের-করার কিন্তু পারছিনা যেহেতু করোনা পরিস্থিতি তাই সবাই মুখে মাস্ক পরে আছে। এবার আমার মধ্যে খুবই ভয় কাজ করছে। নতুন পরিবেশ, তার মধ্যে নিজের ভয় কাটিয়ে এক-দুজনের সঙ্গে কথা বললাম। কথা বলার পর জানতে পারলাম সবার একই রকম অবস্থা সবার মধ্যেই একই রকম ভয় কাজ করছে। তারপর তাদের সঙ্গে মিলে চলে গেলাম কলেজের ক্যাম্পাসের মধ্যে। সেখানে গিয়ে প্রথমেই আমার চোখ আটকে গেলো কলেজের চার পাশের লাগানো অনেক নাম না জানা গাছগুলোর দিকে। সেই গাছগুলোতে অনেক সুন্দর সুন্দর বাহারি ফুল ধরে আছে। যেগুলো দেখামাত্র আমি কোথায় হারিয়ে গেলাম। মুহূর্তের মধ্যে আমার মন ভালো হয়ে গেলো। আমার মধ্যে আর কোনো রকম ভয় কাজ করছে না। কিছু ক্ষণের মধ্যে আমি কল্পনার জগত থেকে ফিরে এলাম কোনো এক বন্ধুর ডাকে। তারপর চলে গেলাম আমাদের ডিপার্টমেন্টের ক্লাসরুমে। সেখানে গিয়ে আবার আমার মনে ভয় কাজ করতে লাগলো। জানিনা আমার ক্লাসের সব বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আমি মানিয়ে নিতে পারবো কি না তারপর ক্লাসে গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পর সবাই বলাবলি করছে ক্লাসে ম্যাম আসছে। কথাটি শুনে আমার খুব ভয় করছে শুনেছি কলেজের স্যার, ম্যামরা নাকি অনেক রাগি হয়ে থাকে। এইসব ভাবতে ভাবতে ক্লাসে ম্যাম চলে এসেছে এবং সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে। শুধু আমি একা একা বসে আছি আর নিজের মনে কি সব ভাবছি। হঠাৎ ম্যামের কথাটা কানে আসতে আমার ঘোর কাটলো আমি দেখলাম ম্যামকে আমি যতটা রাগি ভেবেছিলাম একদম সেই রকম নয়। সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ ম্যাম আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মতোই কথা বলছে। ম্যামকে দেখে ভয় পাওয়ার মতো তেমন কোনো কারণ নেই। যেহেতু আজ আমাদের কলেজের প্রথম দিন তাই আজ আর বেশি ক্লাস হল না। তাই বেশি সময় থাকার প্রয়োজন হয়নি। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গেলাম। এই সবকিছু মিলিয়ে আজ আমার কলেজের প্রথম দিন অনেক সুন্দরভাবে ও মজার সঙ্গে কেটেছে।

....

দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে
নিজেকে সংশোধন করা
এবং সবচেয়ে সহজ কাজ হচ্ছে
অন্যের সমালোচনা করা

– হযরত আলী (রাঃ)

ছাত্রী জীবন

— সম্পা জানা

বিদ্যালয় জীবনটা খুব ভালোভাবে কেটেছে। কিন্তু তারপর যখন কলেজে ভর্তি হব তখন ভাবলাম যে এই মারনরোগ করোনা কবে কাটবে, আমরা কি কলেজে তিন বছর না গিয়ে কাটাব, কলেজটা কি আমাদের অজানা থেকে যাবে। শুধু কি আমরা সার্টিফিকেট আনতে কলেজে যাব। শুধু কি আমরা অনলাইনে পরীক্ষা দিয়ে ডিগ্রি পাব তাহলে পরবর্তী প্রজন্মকে দেওয়ার জন্য আমাদের স্মৃতিতে কী থাকবে। কিন্তু সেই ভাবনার একদিন অবসান ঘটল দুটি পর্যায় পেরিয়ে তৃতীয় পর্যায়ে কলেজ খুলল খুব ভালো লাগছে যে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে মুখোমুখি কোনো পড়া বোঝা কিংবা কোনো বিষয়ে জানা সার্থক হবে। এবং তার সঙ্গে বন্ধুদের সঙ্গে একসঙ্গে বাসে যাওয়া-আসা এই স্মৃতিগুলো সারাজীবন থেকে যাবে কোনোদিন ভুলতে পারব না। তারপর সেই ভয়াবহ করোনার সময় আসেপাশের লোকজনের যে কথাবার্তা তারা বলত "তোরাতো পরীক্ষা দিসনি, না পড়েই পাস করে যাচ্ছিস তোদের এই নাম্বারের কোনো মূল্য নেই।" আজ 16th August আমি খুব খুশি কলেজে এসে যে সেই মানুষগুলোর সঠিক জবাব দিতে পারব ভেবে। এবং আরো বেশি খুশি এই ভেবে আমরা অন্যকলেজে অর্থাৎ সেন্টারে গিয়ে পরীক্ষা দিতে পারব। এবং শুধু আমাদের কলেজ ছাড়াও অন্যান্য কলেজ সম্বন্ধে জানতে পারব। আমি একটি গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না থেকে বাইরের জগৎ সম্বন্ধে জানতে খুবই আগ্রহী। এই পড়াশুনার মাধ্যমে বাইরের ইউনিভারসিটি, শিক্ষক-শিক্ষিকা, পড়াশুনোর জগৎ ও টেকনিক্যাল জগৎ সম্পর্কে জানতে পারব। এবং এভাবেই জীবনে একদিন আমি প্রতিষ্ঠিত হতে পারব এবং সেই গুঞ্জন রটানো মানুষগুলোর মুখে জবাব দিতে পারব।

.....

নরম ও দয়ালু মনের মানুষগুলো
কিন্তু বোকা নয়,
তারা জানে মানুষ তাদের সাথে
কি ব্যবহার করেছিল
তবুও তারা মানুষকে বারবার
ক্ষমা করে দেয়,
কারণ তাদের খুব সুন্দর একটা
হৃদয় আছে।
— এ.পি.জে আব্দুল কালাম

শিক্ষক

— কথামালা মাইতি (শিক্ষাবিভাগ)

আমার জীবনের প্রথম শিক্ষাগুরু হলো আমার বাবা ও মা। আমার প্রথম শিক্ষা গ্রহণ আমার পরিবার থেকে। জীবনে চলতে হলে আমাদের শিক্ষার প্রয়োজন। আর সেই শিক্ষা গ্রহণের প্রথম হাতে খড়ি আমার মায়ের কাছে। মা -এই আমার শূন্য কলসিকে একটু একটু করে জ্ঞানকে পরিপূর্ণ করেছিলেন। আমি যখন প্রথম বিদ্যালয়ে যাই আমার মা-ই প্রথম আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকে আমার শিক্ষা জীবনে শিক্ষক ও শিক্ষিকারদের সঙ্গে পথ চলা শুরু। সেই থেকে একটু একটু করে জ্ঞান অর্জন করে চলছি। শিক্ষক মানে কী একটু করে জানছি। শিক্ষক হল এক কর্তব্যপরায়ন এক মানুষ, শিক্ষক কাছে আমরা কোনো কিছু জ্ঞান, দায়িত্ব কর্তব্য সবকিছু শেখা শিক্ষক থেকে। শিক্ষক হল এক সত্যবাদী মানুষ যিনি সদা সর্বদা আমাদের সত্য বলতে শেখায়। শিক্ষক হলো এমন একটা মানুষ যিনি সবকিছু অন্যায়কে ক্ষমা করে দেন। শিক্ষক আমাদের জীবনে একটি লক্ষ নিয়ে যেতে সাহায্য করে। এবং সেই পথটা শিক্ষকই ঠিক করে দেন। শিক্ষক হলেন ন্যায় বিচার একটি মানুষ, যিনি তার কোনো প্রিয় ছাত্র ও যদি কিছু অন্যায় করেন তিনি তার যথাযোগ্য শাস্তি দেন। শিক্ষকই হলো ছাত্র-ছাত্রীদের একটি খুব ভালো বন্ধু। একটি ভালো বন্ধুই পারে একটা বন্ধুকে উন্নতি শিখরে পৌঁছে দিতে। তাই শিক্ষা বিজ্ঞান বলা হয়েছে একজনই হতে পারে বন্ধু, দার্শনিক, ক্ষমা করা, কর্তব্যপরায়ন নির্লোভী, অহিংসা পরায়ন ইত্যাদি। শিক্ষকই সকলকে ভালো উপদেশ ও পরামর্শদান করে। আমাদের জীবনে সবাই কিছু না কিছু শেখায়। তাই জীবনে চলার পথে সবাইকে শিখতে হয়। তাই আমাদের গুরুজন যারা তারাই হলো আমাদের প্রকৃত শিক্ষক।

.....

যারা আমাকে সাহায্য করেনি
তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ,
কারণ তারা সাহায্য করেনি বলে
আমি নিজের কাজ নিজে
করতে শিখে নিয়েছি।।
— আইনস্টাইন

Education Depertment

— রুম্পা মণ্ডল (শিক্ষাবিভাগ)

Depertment / বিভাগ কথাটির সঙ্গে পরিচয় হয়। বিভাগ কথাটি জানতাম, কিন্তু একটি বিভাগ যে একটি বইকে নিয়ে হয়, সেই Depertment-এর মধ্যে নির্দিষ্ট কয়েক জন শিক্ষক শিক্ষিকা থাকে, নির্দিষ্ট ঘর থাকে এত কিছু সঠিকভাবে জানতাম না। যখন কলেজে উঠলাম, কলেজে ওঠার পর এই Depertment /বিভাগ বিষয়টি সম্পর্কে আরো বেশি কিছু জানতে পারলাম। আমাদের Khejuri College -এর শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ দুটো নির্দিষ্ট ঘর আছে Class করার জন্য, ছয় জন শিক্ষিকা আছেন যাঁরা আমাদের খুব যত্ন সহকারে পড়ান। আমরা কিছু ভুল করলে শিক্ষিকারা যেমন সেই ভুলটা ধরিয়ে দেন। তেমনি সেই ভুলগুলো ঠিক করেদেন। আমাদের Khejuri College -এর Education Deperment এর কথা বলতে গেলে আর শেষ হবে না। এই খেজুরী কলেজে আমাদের শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষিকারাও খুব ভালো। আমাদের যে কোন বিষয়ে খুব সাহায্য করেন তেমনি কলেজের আর অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারাও খুব ভালো বাসেন, উনারাও যেকোন বিষয়ে যতটা পারেন সাহায্য করেন। শিক্ষা হল এমন একটি বিষয় যা সবার মধ্যে থাকা উচিত, এবং সেই শিক্ষারও সম্মান করা উচিত। একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য শিক্ষার খুবই প্রয়োজন। বর্তমান জীবনে চলার পথেও শিক্ষার গুরুত্ব অপরিহার্য। আমাদের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগে কোন অনুষ্ঠান হলেও শিক্ষিকারা আমাদের সে বিষয়ে কীভাবে কী করতে হবে, কেমনভাবে সবকিছু করতে হবে, সবকিছু ভালো করে বুঝিয়ে দেন।

অর্থাৎ আমাদের Education Deperment -এর শিক্ষিকারা আমাদের যে কোন বিষয়ে, কোন সমস্যা এবং কিছু সাহায্যের ক্ষেত্রেও ওনারা ওনাদের সবটুকু দিয়ে আমাদের সাহায্য করেন। এক কথায় বলতে গেলে আমাদের Education Deperment -এ শিক্ষিকাদের কথা আমি কোনো দিনও ভুলতে পারবো না। এবং ওনাদের কাছ থেকে আমি যা যা সাহায্য পেয়েছি সেগুলোও ভুলতে পারবো না। ওনাদের কাছে আমি চিরকতজ্ঞ থাকবো।

.....

একদিনে বা এক বছরে
সফলতার আশা করো না
সবসময় শ্রেষ্ঠ আদর্শকে ধরে থাকে।
— স্বামী বিবেকানন্দ

পড়াশোনা

— উর্মি মণ্ডল (শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ)

আমার ছোটো বেলা থেকে পড়াশোনা করতে ভালো লাগতো। কিন্তু এই পড়াশোনা করতে গিয়ে কিছু ভুল ভাল হ গেলে মায়ের হাতে অনেক পিটান খেয়েছি। তারপর কখন আস্তে আস্তে বড়ো হলাম স্কুলে গেলাম তখন আমি চে করতাম প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন করতে, যদি ভুলে যেতাম সেখানে শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। তারপর যখন কলেজে এল এখানে পুরো উল্টো Sir-Mam সবাই খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ আর আমাদের department এ তো সবাই Mam কোনো নেই। তাই আরও বন্ধুত্বপূর্ণ। Mam রা সব তাদের ভালো লাগা খারাপ লাগা সব আমাদের সঙ্গে share করে। আমাদের share করতে একটু ভয় হয় কারণ ২ বছর ধরে আমাদের online class হয়েছে। Mam দের সঙ্গে তে একটা interuction হয়নি। কিন্তু যেটুকু Mam দের সঙ্গে interuction হয়েছে তাতে আমার একটু ভয় কেটে এবং Mam রা খুবই ভালো। আমাদের খুবই সাহায্য করে। শুধু সাহস করে বললেই হয়। ক্লাসে আমাদের কোনো জিজ্ঞাসা করলে আমরা যদি না পারি তাহলে Mam -রা না পিটে বা না মেরে আমার ত্রুটিটা কোথায় হয়েছে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়। এটা আমার খুব ভালো লাগে। তবে এই করতে করতে ৩টা বছর পার হতে চললো। কিন্তু আ এই কলেজ থেকে চলে যেতে একটু মন খারাপ হবে। কিন্তু কি আর করা যাবে। এটাই নিয়ম। সবাইকেই একটা সময় বিদায় নিতে হবে, অনেক সময় শুরু থেকে শেষ হয় বা শেষ থেকে শুরু হয়। এটাই নিয়ম। তাই নিয়মের বাইরে তো আ যেতে পারি না। সবাইকেই নিয়মের মধ্যে চলতে হয়েছে। আমার ক্ষেত্রেও এটা কোনো ব্যাতিক্রম নয়। তাই যা হবে ভা জন্যই হবে। যাইহোক কালের নিয়মেই সব কিছু বদলায়, কিন্তু আমি কখন বড়ো হয়ে গেলাম এবং আমার পড়াও কখন হয়ে গেল আমি নিজেই বুঝতে পারছি না। আমার সব বন্ধুবান্ধব, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবকিছুই memorable থাকবে।

.....

যে সবার আগে ক্ষমা চাইতে পারে
যে সবচেয়ে বেশি সাহসী,
যে সবার আগে ক্ষমা করতে পারে
সে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী।
আর সবার আগে যে ভুলে যেতে পারে
সে সবচেয়ে বেশী সুখী।।

— অনুকূলচন্দ্র

বৃষ্টিভেজা স্মৃতি

— সন্দীপ মণ্ডল

বর্ষার মাঝামাঝি সময়, সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। বিকেলে প্রবল বৃষ্টির শব্দে ঘুম থেকে উঠে এক কাপ চা রি করে, জানালার ধারে বসে বাবার অফিস ফেরার অপেক্ষা করছিলাম। বাহিরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়ে চলেছে। আচ্ছা। এত থেকে অকুতোভয় বৃষ্টিরা মাটির বুকে ঝাঁপ মারছে, আছড়ে পড়ছে কষ্ট হয় না ওদের, কত ক্ষণ এভাবে বসেছিলাম মনে ; ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ আর বাহিরের প্রবল বর্ষনের আওয়াজ ছাপিয়ে মোবাইলটা বেজে উঠতে ঘোর কাটলো। সন্ধ্যা হয়ে সছে।

'হ্যালো - অপু - বৃষ্টিতে একটু আটকে গেছিরে। রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় গাড়িও চলছে না। টেনশন করিস না, তে একটু দেরি হবে।' মোবাইলটা নামিয়ে রাখলাম। মাও বাড়িতে নেই। দিদিমার অসুস্থতার জন্য মামাবাড়িতে গেছে। সন্ধ্যা সাতটা। বাড়িতে একা থাকার ভয় কাটানোর জন্যই বৃষ্টির দিনে বাবার ফেভারিট খিচুড়ি আর ডিম ভাজা রান্না করতে লাম, বাবা খুশি হবে।

রান্না শেষ কিন্তু বাবার দেখা নেই, অপেক্ষা করতে করতে রাত দশটা বাজলো। চার পাঁচবার মোবাইল ট্রাই করলাম — াচ্ছে না। অবশেষে রাত সাড়ে এগারোটার দিকে বাবা এলেন। দরজা খুলে দেখি বাবা ও একটা প্রৌঢ় মানুষ দাঁড়িয়ে, দূরে টি সাইকেল ভ্যান বৃষ্টির কালো জল মাখছে। বাবা ও অচেনা মানুষটি দুজনে পুরো ভিজে গেছেন। লোকটি ফিরে যেতে য়েছিল কিন্তু বাবা ডাকলেন — 'এসো আজ আমায় এত সাহায্য করলে, আর এই অবস্থায় বাড়ি ফিরবে — এসো এসো ু খেয়ে যাবে — অপু, দুটো গামছা দিযে যা।

'না — বাবু ... বউটার অসুখ। তিনটি ছেলে রইলেও আলাদা সংসার পাতিচে — আমনকের দেখার কেউ নাই। আমি ড় গিয়া ওর জন্য রান্না বুসাইবো যাইতে আজ্ঞা দিন।'।

ওই দিন আমাদের জন্য রান্না করা খিচুড়ি, ডিম ভাজা, টিফিন কেরিয়ারে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। জিভের পরিতৃপ্তি না নও সেদিনের মনে পরিতৃপ্তি হয়েছিল। ভোর রাতে স্বপ্ন দেখেছিলাম — মাটির ঝুপড়ি ঘরে ঝড় জলের রাতে এক রুগ্ন লা খিচুড়ি-ডিমভাজা খাচ্ছে, আর এক বুক পরিতৃপ্তি নিয়ে, পরিবারের কর্তা সেদিকে তাকিয়ে আছে।

.....

দোষ যদি তোর থাকেই কিছু
আগেই নিকেশ কর।
দোষ নিয়ে তুই করলে শাসন
বাড়বে দোষের ঘর।
— ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র।

ক্যামেরা - লেন্স - ফটোগ্রাফি

— সুমিত পাল, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ

একটা ভালো ফটো তোলার জন্য একটা ভালো ক্যামেরা ও একটা লেন্স দরকার হয়, লেন্স-এর মাধ্যমে আমরা ফ
ফোকাস ও ফ্রেম তৈরি করা যায়। আর আমাদেরকে এটা মনে রাখতে হবে যে কোনো লেন্স দিয়ে সবরকম ফটো তোলা য
না লেন্স এর ও বিভিন্ন ধরণের কাজ আছে। যেমন আমরা বাইরে কোনো ফটো তুলতে গেলে আমাদেরকে zoom lanc
বা 55 mm লেন্স ব্যবহার করতে হয়। তাছাড়া বিয়ে বাড়িতে ফটো সুট করার জন্য আমাদের কিট লেন্স বা 32 mm লে
ব্যবহার করতে হয়। কারণ বিয়ে বাড়িতে ফটো তোলার জন্য খুব কম স্পেস থাকে যার কারণে এইখানে আমরা zoo
lance ব্যবহার করতে পারবো না সব থেকে ভালো 32 mm Lance বা 18 - 55 Lance ব্যবহার করতে হয়। স
লেন্স দিয়ে ফটো তোলা যায় কিন্তু ভালো photo ও frame নেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরণের লেন্স ব্যবহার করতে হয় যে
closde short নেওয়ার জন্য 55 mm লেন্স ব্যবহার করতে হয়। দূরে ফটো তোলার জন্য zoom লেন্স ব্যবহ
করতে হয়। তাছাড়া আরো ভালো photo এর জন্য light ও অন্যান্য সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হয় যেমন লাইট কম থাক
ওইখানে আমাদের Flash crine ও 55 mm lance ব্যবহার করতে হয়, আর যেখানে Light বেশি থাকে ওইখা
আমাদের Light টাকে ম্যানেজ করার জন্য যে কোনো ধরণের কাপড় ব্যবহার করতে হবে কারণ যেখানে Lightবেশি থা
ওইখানে Photo তে যে Light পড়ে ওই Lighting টাকে control করতে হয়, তাতে ফটো এবং ফটো Came
Lance আরো ভালো হয়। তাছাড়া আমাদের Camare এর ও বিভিন্ন ধরণের seting থাকে ওইগুলোকে ফ
তোলার জন্য ম্যানেজ করতে হয়। এবং ফটো ফোকাস করার জন্য Lance এর ফোকাসটিকে control করতে হ
Camera Lance photography করার জন্য খুব ভালো হয় লেন্স এর মাধ্যমে আমরা photo frame ও pho
quality ও frame নেওয়া হয় আর Camera তে আমরা ISO Sulter ও এইগুলো কে control করা হয়। এক
ফটো তোলার জন্য Camera Lance দুটোই করা হয় শুধু Lance দিয়ে ও ফটো তোলা যায় না। photo তোলার জ
Camera Lance দুটোই দরকার হয়।

.....

যত উচ্চ তোমার হৃদয়
তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়
হৃদিবান নিঃস্বার্থ প্রেমিক-
এ জগতে নাহি তব স্থান।
— স্বামী বিবেকানন্দ।

পুরোনো স্মৃতি

— মিতালী প্রামাণিক

যখন স্কুল ছেড়ে এলাম ম্যাম স্যার সবার কথা মনে পড়ত, বন্ধু, বান্ধবী সবার কথা মনে পড়ত ভাবতাম স্কুল ছেড়ে চলে ছি। তার মধ্যে একটা খুশি ছিল কলেজ যাবো। কলেজে নতুন কিছু শিখবো, নতুন ম্যামদের জানব ম্যামদের সঙ্গে পরিচয় । ম্যামদের থেকে নতুন নতুন কিছু জানব প্রত্যেকদিন। কিন্তু কলেজের ড্রেস, আইডেন্টি কার্ড সব কিছু ছিল। কলেজে তে পারতাম না লকডাউন ছিল। ম্যামদের সঙ্গে অনলাইন ক্লাস হতো। যখন আবার লকডাউন কেটে গেল ম্যামদের সঙ্গে চয় হলো। কলেজে আসতে খুব ভালো লাগল। বাড়িতে থাকতে বিরক্ত লাগত। কলেজে এসে ম্যামদের সঙ্গে খুব লো সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। ভাবতাম কলেজে এসে নতুন বন্ধুগুলো ভালো হবে কী না। প্রথম প্রথম কলেজে আসতে ভয় তাম ম্যামদেরকেও ভয় পেতাম। কিন্তু ম্যামরা খুব ভালো। ম্যামেরা হল শিক্ষার চূড়ামনি প্রতেকদিন নতুন কিছু শিখতে রি। কলেজে এসে দেখলাম সত্যি খুব আলাদা কলেজ জীবন, স্কুল জীবন পুরো আলাদা। কলেজ জীবনে এসে অনেক কিছু তে পারলাম। ভাবতাম কলেজ জীবনে কী আছে। আমাদের কলেজের পরিবেশ খুব ভালো। বন্ধুদের থেকেও নতুন কিছু লাম। যখন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরি পরিবেশের বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে পরিচিতি হয়। পরিবেশ এবং সময় মানুষকে তে সাহায্য করে।

.....

বাবার চেয়ে যদি কেউ বাসে বেশি ভালো
জেনো তা ধোঁকা
মায়ের চেয়ে যদি কাউকে লাগে বেশি
আপন তাহলে তুমি বোকা।

— স্বামী বিবেকানন্দ

আসক্ত মন

— মৌসুমী মাকুড়

কোনো এক পৌষের গভীর রাতে
তোমারই ভাষা এলো আমারই কাছে।
এলো কোনো চাপা কষ্ট এ বুকে
তোমারই আসাতে গেল সব ধুয়ে।
আমারই অন্তরে এলো কাতরতার ভয়
সরিয়ে দিয়ে করলে তুমি জয়।
দিন গেল, মাস গেল তোমারই সনে
ভাব এল, রস এল আমারই মনে।
তোমারই অনুভূতি, ভাবনা কাছেই এলো
শ্রদ্ধা, সম্মান, প্রেম হয়েই গেলো।
কল্পনাতে গেলো মোর অনন্ত-ভালোবাসা
ফিরতি হয়ে এলো ঘোর রক্ত অন্ধ আশা।
অশ্রুতে ভিজে গেলো অন্তিম কষ্ট
নিরাশায় গিলে, আশা দুমড়ে নষ্ট।

.....

নিত্যতা

— জয়দেব মাইতি

সন্ধ্যা নামলে আমার মন খারাপের আলো ছুটে
যায় তোমার গ্রামে
শালবনি কিংবা শালতোড় হয়ত বা কোন অজানা
এক শ্যামনগরের জঙ্গলের পাশে তখন অপেক্ষা ক
ফেলে রাখা কোন এক নিঃশ্বাস
তারপর!
তারপর আমাদের দূরত্ব মাপতে মাপতে গড়িয়ে
পড়ে বেলা।।

.....

অপেক্ষায় আছি

— সন্দীপ মণ্ডল, প্রাক্তন ছাত্র

মেঘের চল নেমেছে জোরে
চক্ষু টলমল,
অনেক স্মৃতির মাঝে তুমি
করছো কলকল।
মনের সাথে প্রাণটিতেও
পুরোনো ঘনঘটা,
খেজুরী কলেজ, প্রতিষ্ঠা দিবস
মনে খুশির ছটা।
স্মৃতির ঢেউয়ে উথাল পাথাল
মনটা ঝলমল।
বন্ধু সকল, হাসি-ঠাট্টা
ধরতে চাইছে মন।

.....

"মা"

— প্রিয়াংকা সাহু

একজন মা যদি শিক্ষিত হয় তাহলে তার সন্তান, পরিবার থেকে শুরু করে দেশেরও উন্নতি ঘটবে। তাই আধুনিকযুগে 'মা' ক্ষিত প্রয়োজন। 'মা' হলো এমন একজন মানুষ যাকে নিয়ে বলতে থাকলে শেষ হবে না। মায়ের মতোন কেউ নিঃস্বার্থ ও র্থত্যাগী হয় না। মা, যিনি তার সন্তানের সর্বত্রই ভালোভাবেন। মা, যিনি একজন অজ্ঞাত শিশুকে ছোট থেকে বড়ো করে দের মানুষ হিসেবে পরিণত করে। মা খুবই দায়িত্বশীল ও দয়ালু প্রকৃতির হন। একজন মা চাইলে সবকিছুই করতে পারেন র সন্তানের নিরাপদের জন্য, তাকে সুস্থ রাখার জন্য।

এ.পি.জে. আব্দুল কালাম বলেছেন —

তোমার মা হল
একমাত্র সেই ব্যক্তি
যিনি কখনোই নিজের জন্য সময়
নিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন না
কারণ তিনি সবসময় তোমার জন্য
ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে থাকেন।

একজন সন্তানের কষ্ট হলে সর্বপ্রথম একজন 'মা' ই সবচেয়ে বেশি কষ্ট পান। মা যিনি বছরের ৩৬৫ দিনই কাজ করে কেন, কোনোরকম পারিশ্রমিক না নিয়ে। মা, যিনি বাবার বাড়িতে একজন বালারূপে দায়িত্ব সম্পন্ন করেন, স্বামীর বাড়িতে কজন স্ত্রীরূপে আবার সন্তানের পালনকারী হিসেবে। মা যিনি চাকুরিজীবি হিসেবে চাকরি করতেন, যিনি একজন পরিচালনাকারী সেবে পরিবার পরিচালনা করে থাকেন। মা, যিনি এতগুলো কাজ একসঙ্গে সম্পন্ন করে থাকেন। তিনি একজন রোল ডেলই বটে, আমার মা আমার কাছে একজন রোল মডেল। মা শিক্ষকের থেকে কোনো অংশেই কম নন। কারণ শিক্ষক যমন ছাত্রকে শিক্ষাদানের মাধ্যমে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন ঠিক তেমনি একজন মা একজন শিশুকে সর্বপ্রথম বাস্তব বনের শিক্ষাদান করে থাকেন। তাই শিশুর জীবনের প্রথম শিক্ষক হলেন তার মা।

.....

"যদি কোনদিন তোমার জীবনের
চলার পথে সামান্য কোনো সমস্যা না আসে,
তুমি নিশ্চিত হতে পারো।
যে তুমি ভুল পথে হাটছো।"
— স্বামী বিবেকানন্দ।

হঠাৎ ভেঙে গেল স্বপ্ন

— মালতী দাস, প্রাক্তণ ছাত্র

করবো আমি চাকরি, মস্ত বড় হব,
আনন্দঘন মন নিয়ে বলবো সারাপাড়া।
মাকে বলব উচ্চ কণ্ঠে মাগো ওমা শুনছো
তোমার মেয়ে যে চাকরি পেয়েছে তুমি মাগো
নাড়ু বানিয়ে দাও না।
আজ কিন্তু, তোমার কোনো বাহানা শুনবো না মাগো!
নাড়ু তোমাকে বানিয়ে দিতে হবে,
আনন্দপূর্ণ এই দিনে।
বাবাকেও বলব বাবা, ও বাবা শুনছো!
তোমার মেয়ে যে চাকরি পেয়েছে,
নিত্যনতুন জামা কিন্তু কিনে দিতেই হবে, কিনে দিতেই হবে।
চলোনা চলো কিনে দেবে,
তোমার অজুহাত আজ শুনব না যে।।
হঠাৎ স্বপ্নটা ভেঙে গেল,
একি এতক্ষণ আমি কোন জগতে ডুবে ছিলাম।
যেই স্বপ্ন কোনো দিনও আমার সফল হবে না জানি,
সেই স্বপ্ন আমার মনের অভ্যন্তরে এল কেন।
মনটা খানিক-ক্ষনের জন্য দুঃখময় হযে গেল,
তারপর বারান্দার উঠোনে এসে দেখলাম
মা বানাচ্ছে নাড়ু।
হঠাৎ বাবা পাশ থেকে বলে উঠল
এই যে মা শুনছিস,
তোর জন্য একটা ভালো জামা নিয়ে এসেছি।
আমি অবাক হয়ে গেলাম
মনে মনে ভাবলাম
স্বপ্নে দেখা নাড়ু আর জামা গেছে থেকে।
কিন্তু চাকরি হারিয়ে গিয়েছে —
আমার জীবন থেকে।

.....

মৃত্যুর পরে

— অমিত কুমার পণ্ডা,
অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

আজিকে হয়েছে শান্তি
জীবনের ভুল ভ্রান্তি
সব গেছে চুকে।
রাত্রিদিন ধুক্ ধুক্
তরঙ্গিত দুঃখ সুখ
জমিয়াছে বুকে।
যত কিছু ভালমন্দ
যত কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব
কিছু আর নাই।
বল শান্তি বল শান্তি
দেহ সাথে সব ক্লান্তি
হয়ে যাক ছাই।

.....

উন্মাদ

— কৃষ্ণকান্ত দাস

আমরা খুঁজি ভাতের গন্ধ আবর্জনার স্তূপে
পাকস্থলীর যাতনায় পাশবিক বর্ণের চর্মভেদ
সাথে উদ্বেলিত আবেগের অবিচ্ছিন্ন উচ্ছেদ
গোপনে সাধিত হয় ব্যথিত হৃদয়ের উত্তাপে
আমরা খুঁজি পরিতৃপ্তি উচ্ছিষ্টের স্বাদে
রঙের খেলা, স্নিগ্ধ বাতাস, পূর্ণিমার চাঁদ
সবই ইন্দ্রিয়াতীত জানোনা? আমরা তো উন্মা
প্রেমদুয়ারে অস্পৃশ্য আত্মা ফুঁপিয়ে কাঁদে।
আমরা খুঁজি সহানুভূতি রুক্ষ পাষানবক্ষে,
অট্টহাসির অট্টালিকায় ক্রমশ পিষ্ট, তবুও হাসি
তব স্বর্গলোকের উপবনে আমরাই নরকবাসী
আমরা খুঁজি মৃত্যুশান্তি এই মৃত্যুপুরীর কক্ষে।

.....

"স্বীকারোক্তি"

— শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, শিক্ষক, বৃত্তিমূলক শাখা, খেজুরী কলেজ

আজকে আপনারা অগনিত জ্ঞানী, গুনী, বুদ্ধিজীবি আমাকে সম্মান জানাতে উপনীত হয়েছেন, আমি নাকি গণিতশাস্ত্রে h.d. করে ভারত সরকার থেকে বিশেষ উপাধির অধিকারী। তাই, আজকের আমাকে একজনকে স্বীকার করতেই হবে। মার স্বীকারোক্তি একটি ছোট গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরছি —

আমি ছাত্রাবস্থায় অঙ্কে ভীষণ দূর্বল ছিলাম। এমনকি ক্লাস পরীক্ষাগুলোতে পাশ করতে পারতাম না। আমাকে অঙ্কে রবুত করার জন্য আমার বাবা খুঁজে খুঁজে এক জাঁদরেল শিক্ষক নিয়োগ করেছিলেন। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানাবার বিশেষ তি সম্পন্ন সেই শিক্ষক যার ইয়া বড় গোঁফ, মোটা ভুরুর নীচে আগুনের মত গনগনে দুটি চোখ, হাতে মোটা বেতের ঠি থাকত সর্বদা, গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর যেন উতলা মেঘের গর্জন। উনি যখন পড়াতেন প্রায়ই গুরুগম্ভীর মেঘের গর্জনে শোনা ত। ঘড়ি ধরে দুঘন্টা, সপ্তাহে তিন দিন। আমি যদি কাউকে বেশী ভয় পেতাম তো আমার সেই অঙ্কের শিক্ষককেই ভয় তাম। তাও যমের মত। তাঁর পড়ানোর পদ্ধতি ছিল অদ্ভূত, ভয়াবহ, প্রশ্নমালার সবগুলো অঙ্ক খাতায় গড় গড় করে কষে তেন আমি বুঝতে পারলাম কি পারলাম না সে ব্যপারে আদৌ পাত্তা না দিয়ে নিজের কষা অঙ্কগুলো শেষ করে নির্দেশ তেন, অন্য খাতায় সেই অংকগুলো কষে দিতে হবে। না পারলে গজনসহ বেদম প্রহার। প্রাণ বাঁচানোর দায়ে আমি ক্ষকের করানো অঙ্কগুলো কমা-পূর্ণচ্ছেদসহ মুখস্থ করার চেষ্টা করতাম। ফলে অংকের বিভিন্ন অংশগুলো উল্টো-পাল্টা য় যেত। শিক্ষকের থেকে মার খাওয়া যত বাড়তে থাকল পরীক্ষার নাম্বার তত কমতে থাকল। আর তার ফলে অঙ্কের প্রতি তি উত্তরোত্তর বাড়তে শুরু করল। অষ্টম শ্রেণীর হাফইয়ারলি পরীক্ষায় অঙ্কে শূন্য পেলাম। তখন আমার বাবা ঐ শিক্ষক শয়কে বিদায় দিয়ে নতুন শিক্ষক মহাশয়ের ব্যবস্থা করলেন।

কিন্তু যেদিন বাবার পিছন পিছন নতুন শিক্ষককে ঢুকতে দেখলাম। আমি ভয় পাওয়া তো দূরের কথা হাসি চেপে রাখা য় হল। একী অঙ্কের শিক্ষক আবার এমন হয় রোগা তো রোগা একেবারে কাঠির মত, মাথায় উস্কো-খুস্কো চুল, মুখে প্তাহের খোঁচা কোঁচা দাঁড়ি। জামা-কাপড় কেমন মলিন। আলু-থালু চোখে মোটা ফ্রেমের মোটা কাঁচের চশমা, বয়সের ারে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়েছেন, কিরমম যেন সংকোচ সংকোচ ভাব। হাতে একটা লম্বা ছাতা, কাঁধে একটা ন্তিপুরী পুরনো ঝুলানো ব্যাগ যার ভিতর থেকে এক তাড়া কাগজ উঁকি মারছে। আমি ভয় পাব কী এই শিক্ষকতো আমাকে খে সিঁটিয়ে আছে।

স্যার আমার একটা হাত ধরে বললেন, তুমি আমায় একটু সাহায্য করো আমি প্রায় অঙ্কগুলো সলভ করতে গিয়ে আটকে বো তুমি একটু মাথা খাটিয়ে উত্তর দিও তোমার তো কমবয়সী ব্রেন, ফ্রেশ বুদ্ধি তুমি ঠিক পারবে। আর কাউকে কিন্তু বলবে , তাহলে আমার টিউশানটি চলে যাবে। খুব বিপদে পড়ে যাব।

আমি বিস্ফারিত চোখে আমার নতুন শিক্ষকমশাইকে দেখছিলাম, কেমন কাঁচু মাচু মুখ করুন স্বর। চোখ দুটো দেখে রী মায়া হয়, হঠাৎ কেন জানি না, মনে একটা অদ্ভুত জোর পেলাম। কোন একটা ভালো কাজ করার ইচ্ছা জাগলে মনভাবে স্নায়ু চনমনিয়ে ওঠে, তেমনই উদ্দীপনা, উৎসাহ টের পেলাম বুকের মধ্যে, ঠিক করলাম, বাঁচাতেই হবে আমার ক্ষকমশাইকে, কোনভাবে টিউশানটা চলে যেতে দেওয়া যাবে না। তার জন্য আমাকে নিজ নিজ অঙ্ক জানতে হবে, বেশী শী করে অঙ্ক শিখতে হবে। মাথা খাটাব, ভাবব অঙ্ক নিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করতে আর ও করতে টিউশান বাঁচাতে গেলে মাকে করতেই হবে। মানুষটা বড় অসহায় আমাকে পারতেই হবে - পারতেই হবে।

অবাক ব্যাপার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই অঙ্কের ভীতটা কর্পূরের ন্যায় উবে গেল। অঙ্কটা নিয়ে বেশী করে চর্চা করতে রু করলাম। অঙ্কের বই নিয়ে দিনরাত পড়ে থাকলাম। উদাহরণ দেখে দেখে এবং শিক্ষকমশাইয়ের সাহায্য নিয়ে প্রশ্নমালার

পর প্রশ্নমালা বুঝতে শুরু করলাম। আস্তে আস্তে ব্রেনের জট খুলতে থাকল। একটার পর একটা অঙ্ক করে যেতে থাকলাম। একটাই লক্ষ্য শিক্ষকমশাইকে বাঁচাতে হবে। তিন মাসের মধ্যে অঙ্ক বিষয়টি আমার নেশায় পেয়ে বসল। এতদিনে বুঝতে পারলাম একটা শক্ত অঙ্ক অনেক চেষ্টা করে Solve করার পরে যে অনাবিল আনন্দ পাওয়া যায় তা আগে জানতাম না।

হয়তো একই অঙ্ক দুজনে করছি লড়াই করছি, আমার মাথায় জেদ চেপে যায় চোয়াল শক্ত করে ভ্রুকুঁচকে ব্রেন খাটাই - ঠিক রাস্তা পেয়ে যাই। বিপুল আত্মবিশ্বাস তৈরী হয়ে যায়। বলি "স্যার আপনার টিউশান বাঁচিয়ে রাখবই"।

রেজাল্ট যেদিন বেরোল, সেদিন স্কুলের সব স্যারেরা হতবাক। আষাঢ়ের গল্পের মত মনে হবে। যে ছেলে অঙ্কে কোনদিন পাশ করতে পারেনি, এমনকি ১০০-এর মধ্যে ০ পায়, আজ সে অঙ্কে একশোর একশো, মিরাকেল বললে কম বলা হয়। তিনবার খাতা দেখেও এক নাম্বার কমাতে পারেনি অমলেশ স্যার।

রেজাল্ট নিয়ে নাচতে নাচতে বাড়ী ফিরেই বাবাকে বললাম, আমাকে এক্ষুনি টিউশান শিক্ষকের কাছে নিয়ে চলো উনাকে পরীক্ষার খাতাটা না দেখানো পর্যন্ত আমার ছটফটানি কমবে না।

বাবার মুখটা দেখলাম গম্ভীর আমি এত ভালো রেজাল্ট করেছি তাতে কোনও উচ্ছাস নেই খুব শান্ত গলায় নীচু গলায় বাবা বললেন, হ্যাঁ তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাব বলেই অপেক্ষা করছি। উনিও তোমাকে দেখতে চাইছেন।

আমাদের গাড়ীটা কোন বাড়ীর সামনে না দাঁড়িয়ে হাসপাতালের গেটে গিয়ে দাঁড়াল। আমি বাবার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে বাবা বললেন তোমার শিক্ষকমশাই গত পরশু থেকে হাসপাতালে ভর্ত্তি রয়েছেন, খুব ক্রিটিক্যাল অবস্থা। উনি এতই অসুস্থ যে, বহুকষ্টে আমার দিকে তাকালেন, আমার মার্কশীট দেখে উনার চোখ আনন্দে চিক চিক করে উঠল। শুধু বারে বারে আমার হাতটা তাঁর দুর্বল হাতে চেপে ধরার চেষ্টা করছিলেন। বাবা উনাকে আশ্বস্ত করলেন সেইদিন রাত্রে উনি মারা গেলেন।

পরের দিন রাত্রে বাবা আমাকে ডেকে উনার কাঁধে ঝোলানো কাগজ উঁকি মারা ব্যাগটি দিয়ে বললেন — 'তোমার শিক্ষকমশাই এটা তোমাকে দিয়ে গেছেন'। ব্যাগ খুলে দেখলাম কাগজে হায়ার ম্যাথমেটিক্সের প্রচুর হিজিবিজি কাটাকুটি যা আমার ধারণার বাহিরে। হায়ার ম্যাথমেটিক্সের গবেষণামূলক কাজ, মানুষটা যে এতবড় গুণি, তা আমরা কেউ বুঝতে পারিনি। বাবা বললেন উনি রিসার্চটা শেষ করে যেতে পারলেন না। এই কাজ তোমায় দিয়ে গেছেন এবং বলে গেছেন — তুমি বড়ো হয়ে এই গবেষণা শেষ করবে। এই কাজটা সফল হলে তুমি দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

এতক্ষণে আপনারা যা বুঝলেন, আমি তাই অকপটে স্বীকার করছি আমি স্বর্গত শিক্ষকমশাইয়ের কাছে ঋণী। উনি এমন শিক্ষক, যিনি অভিনয় করে একটি ছাত্রকে উৎসাহিত করেছেন। আমার চেতনাকে জাগিয়েছেন নিজের ইগো বিসর্জন দিয়ে শুধু এই টুকুই নয় — উনি আমাকে এই সম্মান পাওয়ার সুযোগ দিয়ে গেছেন।

"He made me what I am!"

.....

বই

— চৈতালী গিরি
শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ - পঞ্চম পাঠমালা

তুমি তো বই তোমার শব্দে থই থই,
আমি শুধুই পৃষ্ঠা উল্টে যাই
এখানে আমার অস্তিত্ব কই।।
জীবন যখন জীবিত হয়ে
জীবন্ত এক লাশ,
স্বপ্ন তখনও তুমি দেখাও
আরেক নতুন উপন্যাস।
চেতনার বিকাশ ঘটিয়ে
ভাঙে মনে রুদ্ধ দ্বার
জ্ঞানের আলোকে ভরিয়ে তোলো
তা আমি কেমনে করি অস্বীকার।।
তোমায় নিয়ে পড়তে বসা
হোক না নিত্যদিনের অভ্যাস,
বইকে তাই আমি আপন করি
সকাল থেকে সাঁঝে।
তাই তো আমার ভালোবাসাটা
বেঁচে আছে এই বইয়েরই ভাঁজে।।

.....

সমাজ বন্ধু

— কৃষ্ণা মিদ্যা, ছাত্রী - সংস্কৃত বিভাগ,

সমাজের বুকে, নিরন্নমুখে
অন্ন জোগায় যারা
দিনান্তে তাদের অন্ন জোটে না,
তারাই সর্বহারা।
ভোরের আলো ফোটবার আগে,
যেতে হয় শুধু মাঠে।
রোদ বৃষ্টিতে, ভিজে হয় সারা,
খুবই কষ্টে কাটে।
মাথার ঘাম পায়ে ঝরিয়ে,
কষ্টে ফসল ফলায়।
সমাজকে শুধু দিয়ে যায় তারা,
ন্যায্য দাম কি পায়!
দুঃখে যাদের জীবন কাটে,
হারিয়ে স্বাধীন সত্ত্বা।
খবরে শুনি অনেক কৃষক,
করছে আত্মহত্যা।
কিন্তু সে হায় দলিত হেলিত,
দুঃস্থ লোকের প্রতি।
দেখায় না কেউ মহানুভবতা,
দেখায় না সম্প্রীতি।
যাদের শ্রমে চলছে সমাজ,
মিটছে পেটের ক্ষুধা।
কেউ কি তাদের রাখছে খবর,
শুনছে ওদের কথা।
সমাজবন্ধুসম সমানভাবে,
ওদের করতে হবে যুক্ত।
তবেই মোরা পারবো করতে,
সমাজ শোষণমুক্ত।

.....

"ভ্যাবলার পাকা দেখা"

— বিধান দাস, শিক্ষক, বৃত্তিমূলক শাখা

আজ ভ্যাবলার পাকা দেখা। ভ্যাবলার পরিবারের সকল সদস্য যাত্রা শিল্পী। মেয়ের পরিবারের সকলে বিভিন্ন পে যুক্ত। কিন্তু মজার ব্যাপার হল দুই পরিবারের সকল সদস্য বাস্তব জীবনে নিজ নিজ ভঙ্গীমায় কথা বলতে অভ্যস্ত।

ভ্যাবলার বাবা লোকজন নিয়ে মেয়ের বাড়ীর সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন — ছিঃ ছিঃ হচ্ছেটা কী? হচ্ছে আমার মাথা হেট। যেখানে বিয়ের সম্বন্ধ করতে এলাম সেখানে অভ্যর্থনা করার মতো নেই।

এমন সময় মেয়ের বাবা এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন আরে বাস, ঢুকে পড়ুন, ঢুকে পড়ুন — ভিতরে সিট খ ঢুকে পড়ুন, আস্তে প্লীজ। এমন সময় মেয়ের দাদা উপস্থিত। তিনি আবার কবি —

পাখাটা চালিয়ে দিই, সবার বেরোচ্ছে ঘাম,
ওয়েলকাম, ওয়েলকাম, ওয়েলকাম।

হাঃ হাঃ হাঃ হাসালে মোরে বালক। এতক্ষণ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একবার নয়, দুইবার নয়, কয়েকবার কলিং বাজিয়েও কারোর টিকির নাগালটি খুঁজে পাইনি — এখন এসেছে ওয়েলকাম করতে — হাঃ হাঃ হাঃ - এমন সময় দাদাকে সংগে নিয়ে একটি বড় থালাতে নাড়ু, সিঙ্গড়া, রসগোল্লা নিয়ে উপস্থিত হলেন। সবার সামনে বসলো। ভ্যা আড়চোখে মেয়েকে দেখে আর মুচকি মুচকি হাসে। মেয়েও ভ্যাবলাকে আড় চোখে দেখে আর মুচকি হাসে — এই দে মেয়ের দাদা বলে উঠল — নাড়ু, সিঙ্গাড়া,, রসগোল্লা - খেয়ে নাও সব মিষ্টি তার পরে জল খেও পরে শুভদৃষ্টি।

এই শুনে ভ্যাবলার বাবা একটি নাড়ু নিয়ে মুখে নিয়ে যেই চাপ দিয়েছে —

আঃ আঃ

পিতা, পিতা, —

এতো নাড়ু নয়, এ যেন পর্বত শিখর থেকে বেরিয়ে আসা ঝরনার পাদদেশে থাকা শ্বেত শুভ্র পাথরের নুড়ি।

আঃ —

এই শুনে মেয়ের বাবা শ্লোগান দেওয়া শুরু করল —

নারকেলের কালো নাড়ু ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও, —

নারকেল নাড়ু তোমায় আমরা ভাঙছি ভাঙবো।

ভ্যাবলার বাবা রেগে বলে উঠলেন —

না না না — যে বাড়িতে অভ্যর্থনা দেবার মত কেউ নেই। যেখানে একটা সুস্থ মানুষ বসবাস করে না। তাছাড়া এই কা ট্যারা, প্যাঁচার মতো এই মেয়ের সংগে বিয়ে দেবনা। কখনো না — কভি নেহি -

না না পিতা আপনি উত্তেজিত হবেন না। আপনার উত্তেজনার কারনে ইতি পূর্বে ৭২টি সম্বন্ধ ভেস্তে গেছে। আজকের শুভক্ষণে, শুভলগ্নে আপনি এমন সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি এই মেয়েকেই বিয়ে করবো। এই মেয়ে ছাড়া আমি বাঁচবে প্রয়োজনে আপনাকে পরিত্যাগ করে, পরিবার পরিত্যাগ করে শ্বশুর বাড়ীতে বসবাস করবো। তবু আপনার সিদ্ধান্ত মেনে না। হাঃ হাঃ হাঃ মেয়ে তখন তো রেগে মেগে মিষ্টির থালা উল্টে ফেলে দিয়ে বিয়ে নাকচ করে বেরিয়ে গেল —

ভ্যাবলা তখন বুক চাপড়াচ্ছে; কাঁদতে কাঁদতে বলছে —

না না না তুমি এই মেয়ে বিয়ে করতে পার না। তোমার জন্য সংসার ছাড়িলাম, তুমি আমাকে কাঁদাতে পার না —

"আমি তুমার জন্য কাঁদি, তুমার মন কি কাঁদে না
কাঁদালে কাঁদিতে হয় — তাও তুমি জানো না।"
"বন্ধু তোমায় বেসে ভালো আমার ওকি জ্বালা হল
কাঁদিতে জনম গেল আর কাঁদিতে পারি না।"

আমার মত কয়জন বলো, বাসবো তোমায় এত ভালো সুবাস ছাড়া ফুলের বন্ধু পাশে তো কেউ থাকবে না।

যে আগুনে জ্বলছি আমি, সেই আগুনে জ্বলবে তুমি
নিজের ভুলে কাঁদবে যেদিন পাশে তো কেউ থাকবে না।

করোনা ভাইরাস

— রুমারাণী মণ্ডল

ন দেশেতে জন্ম নেওয়া নতুন একটি ভাইরাস
াভেন করোনা নামটি তাহার সৃষ্টি করেছে ত্রাস।
রোনা আজ জগৎ জুড়ে করেছে এসে তাড়া,
াতঙ্কিত মানব সবাই কেমনে পাবে ছাড়া?
মেষেতে রূপ ধরেছে যেমন মহামারী
মের মতো নিচ্ছে কেড়ে অনেক নর-নারী।
রোনা এক মরণ ব্যাধি শুনছি সবার মুখে,
নশূন্য হাট-বাজার সব এই ব্যাধিটির দুখে।
খোশ পরে শতেক মানুষ বন্দি আজি ঘরে,
াহির হলে করোনা যদি তাকে এসে ধরে।
ড়ের মাঝে যেওনাকো বন্ধ করো মেলা,
রোনা যে খুবই তীব্র করো নাকো হেলা।
াকে মুখে মুখোশ লাগাও বাইরে যখন যাবে,
ধৌত করো হাতটি তোমার যখন কিছু খাবে।
চেতন হও চলার পথে বাঁচাও নিজের জীবন,
ই ভাইরাসে ধরলে তোমায় হবে তোমার মরণ।

.....

প্রকৃতি

— সুভাষ মান্না

প্রকৃতির ভোরের প্রাতে,
সূর্য উঠেছে হেসে
ভোরের অন্তহীন অখিলে,
চাষিরা তাই হেঁটে চলে।
গ্রামের পথের পারে
তাল গাছেরই সারি।
পাশা পাশি কাদা মাটির
দু-একটি খড়ের বাড়ি।
মাঝ দিয়ে বয়ে যায়
দেখ স্রোতহীন নদী।
কলসিতে ভরে জল
সুন্দরী রমনী
মাঠে শুনি কোলাহল করে,
চড়ুই, বাবুই, শালিকেরা।
চারিদিকে ধান গাছ,
সবুজে সবুজে ভরা।
স্নিগ্ধ বাতাসে দোলাচ্ছে মাথা,
সবুজ কচি ধানের পাতা।
ভেসে আসা ঝাপসা
; সবুজ ধানের গন্ধে,
এদের কথা শুনি
নিত্যনতুন কবির ছন্দে।
চারিদিকে সবুজে ভরা কত শত গাছ
বৃষ্টির দিনে দেখি প্রকৃতির দারুন সাজ
তাই সবুজ মাঠের মাঝে,
হেঁটে চলি আনমনে।
সন্ধ্যার ডাক শুনি দূরে,
ওই সারস গমনে।
প্রকৃতি তুমি সুন্দর থাক
এমনি সবুজের আবেশে।
মেঘ রাশিগুলি নেমে আসুক
তোমার দিগন্ত রেখার শেষে।।

.....

আকুতি

— আদিত্য প্রামাণিক

স্রষ্টার সেরা সৃষ্টি মানব জাতি
জ্ঞানে গুনে বুদ্ধিতে সেরা অতি
তাহারি একটুখানি খেলায়
বিশ্বের মানবগণ আজ স্তব্ধ, ভীত
বিপন্ন কত অসহায়।
খুন, লোভ, হিংসা আক্রোশ,
আর পাপের কি এই পরিনাম?
জ্ঞানের কত অপব্যবহার
মানুষ এক আলোবর্তিকা
সুপথ নির্দেশনায় হবে চালিত।
নহে তাহা নহে পাপ পথেই হয় ধাবিত
অকারণ যাবে কাটে, খুন করে।
গুলি করে বোমা ফেলে
ধ্বংস করে মানবকুল
কত শত শিশু কত নরনারী।
হারিয়েছে প্রাণ অকারণ
পাপ কি নির্মম কি ছিল এদের অপরাধ?
অকারণ সৃষ্টিকে মারিবার আছে কি কারো অধিকার?
পন্যে, খাদ্যে ফলে সব কিছুতে বিষ মিশিয়ে
কত ঠকবাজ চাল, ডিম, সব্জি লকল করে।
কত কৌশল মানুষ মানুষকে মারিবার জন্য
ধিক ধিক ঘৃন্য এ জ্ঞানের অপব্যবহার,
পৃথিবীর প্রশস্ত বক্ষ কি আজ পাপে পরিপূর্ণ
যার ফলে স্রষ্টা দিয়েছেন এ কঠিন ব্যাধি,
মানুষের পর।
দেশের রাণী বার বার সদা বলিতেছেন
সতর্কবাণী,
শুনে নাহি দুয়ারে হাজির মরণ ব্যাধি
জেনেও মানুষ করে ছুটোছুটি,
করিতেছে নিজের দেশের ও দশের ক্ষতি।
আজ সবার কাছে এ নগন্যার কাতর আকুতি,
আসুন সবাই ক্ষমা চাই, ক্ষমা চাই, দয়া চাই
সে পরে পরে কাঁদি
ক্ষমাশীল, স্নেহময় ক্ষমা করিবেনই তিনি
দয়া করে সব বলা মজিবত।
নিবেন সরিয়ে
বিশ্বে আবার শান্তি আসিবে ফিরে।

.....

রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' : প্রকৃতি ভাবনা ও স্বদেশ চেতনা

— আত্রেয়ী মাল, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের 'কবি সার্বভৌম' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সৃষ্টির বিপুলতায় ও বিচিত্রতায়, ভাবগভীরতায় ও শিল্প নিপুণতায় একটি দীর্ঘস্থায়ী যুগের প্রধান ব্যক্তিরূপে অভিহিত হতে পারেন। একই আধারে কবি, নাট্যকার, ছোট গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, রম্যরচনাকার, অনন্ত জীবনতৃষ্ণা, মানবতাবাদী মধুরতা, অসম্ভব প্রাকৃতিক উষ্ণতাবোধ, এবং সেইসঙ্গে অরূপ তত্ত্ব, এক নবজীবনবোধের মোড়কে কবিতার প্রাণস্পন্দনকে আরো উজ্জ্বল করে তুলেছে। 'মানসী' - প্রকৃতির উষ্ণতায় মোড়া সেরকমই এক কাব্য। তবে শুধু প্রকৃতি নয়, স্বদেশ বোধেও তাঁর আত্মসমাহিত বিহার। 'মানসী' কাব্যে এই প্রকৃতিচেতনা ও স্বদেশ ভাবনার রঞ্জিত আলোক সুষমা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

'মানসী' রবীন্দ্রনাথের সার্থক কাব্য সৃষ্টি। কারণ : 'কবির সংগে একজন শিল্পী এসে যোগ দিল' এখানেই। মানুষ কবির মধ্যে হঠাৎ আগত এক অসাধারণত্ব কিন্তু জন্মগত শিল্পী করে তুলেছিল তাকে। 'আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, তাহে ভালবাসা দিয়ে' যে মানসী প্রতিমার চক্ষুদান করলেন রবীন্দ্রনাথ, তার প্রাণস্পন্দনের একটি হল প্রকৃতির চিরপ্রবাহিত প্রানধারার বিচিত্রলীলা।

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে চির সুন্দরেরই সৌন্দর্য্য অনুভব করেছেন। ষড়ঋতুর উৎসবের বিচিত্রলীলার মধ্যে সেই পরমসুন্দরের (অরূপ) লীলা, ঘন মেঘে তাঁর চরণ, শ্রাবণের ধারায় তাঁরই বিরহবাণী, কদম্বের বনে তাঁর গন্ধের অদৃশ্য উত্তরীয়, শরৎের আলোক শতদলের উপর তাঁর চরণ, বসন্তের দক্ষিণ হাওয়ায় তার স্পর্শ। বৃক্ষরাজি মৃত্তিকার মর্ত্যপটে সুন্দরের প্রাণমূর্তি — প্রকৃতির সৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথ এভাবেই অনুভব করেছেন। তাঁর 'একাল ও সেকাল' 'বর্ষার দিনে', 'আকাঙ্খা', 'মেঘদূত' — বর্ষাঋতুকে অবলম্বন করে লেখা, 'কুহুধ্বনি' বসন্তের ভাববাণী, সিন্ধুতরঙ্গ, 'প্রকৃতির প্রতি', 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' প্রভৃতি প্রকৃতির রুদ্র ও রহস্যময় ভাবের প্রকাশক। আসলে কবি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে যেরূপ মুগ্ধ হয়েছেন, তাঁর রুদ্র মূর্তি রহস্যময়তা ও নিষ্ঠুরতাও তাঁর চিত্তকে সেরূপ আলোড়িত করেছে।

'একাল ও সেকাল' কবিতায় কবি প্রাচীন সাহিত্যের বর্ষাবিরহবিধুর প্রণয়িনীদের অমর ছবি মানস নেত্রে দেখেছেন। বুঝেছেন, পৌরাণিক ও প্রাচীন যুগ থেকে একাল পর্যন্ত নরনারীর অন্তরতম সত্তার কোন পরিবর্তন হয় না। তাই 'আজও আছে বৃন্দাবন মানবের মনে' এবং 'এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয় কুটিরে'। রবীন্দ্রনাথ বর্ষার পরিপূর্ণতার কবি। বর্ষার বহুবিচিত্ররূপ ও অন্তর্নিহিতভাব, বাইরের মূর্তি-বৈভব ও অন্তরের রসময়তা, এর রোমান্টিকতা ও গূঢ় স্বপ্ন-ব্যঞ্জনা, কবির কাব্যে বিস্ফোরিত। বর্ষার বাইরের রূপদর্শনে কখনো কবিচিত্ত ময়ূরের মত নেচেছে, কখনো আহ্বান করেছে। এমন দিনই প্রেমের চরমক্ষণ।

—'এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়'।

অথচ সে নেই। এই বিরহবেদনা কালিদাসে আছে লৌকিক প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে। আর রবীন্দ্রনাথে আছে অন্তরের অন্তরতম প্রিয়ের জন্য। মানসীর 'মেঘদূতে' যক্ষ-যক্ষিনীর বিরহের উপর নতুন আলোকসম্পাত করেছেন। এখানে কবির বিরহিনী মানস প্রিয়া অশরীরী। সে অনন্ত সৌন্দর্য ও প্রেমের রাজ্য অলকাতে একাকী জেগে আছে। কবিকে এখন চিরন্তন বিরহতে, অপ্রাপ্তির বিষন্নতায় দগ্ধ হতে হবে —

"কেন উর্দ্ধে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ।"

অর্থাৎ বর্ষা-প্রকৃতি বিরহ বাণীর রূপায়ন।

বিভিন্ন ঋতুর সঙ্গে বিভিন্ন ফুল-পাখি-বর্ণ-গন্ধ অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। বর্ষায় কদম্ব-কেতকী, ময়ূরের কেকাধ্বনি; শরৎে শুভ্র কাশ ও হংসরব; বসন্তে অশোক-কিংশুক-নবমল্লিকা, কোকিলের কুহুরব ও ভ্রমর গুঞ্জন। এ সব ঋতুর ভাব-ব্যঞ্জনা-বাণী

যেন ফুল ও পাখির দ্বারা বাইরে প্রকাশিত হয় এবং মানবসনের নিভৃত দ্বারে আঘাত করে এক অভিনব সুরেরমুক্তি ঘটায়। এভাবেই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মনের এক চিরন্তন লীলা চলে।

'কুহুধ্বনি' বসন্তের যৌবন-শিহরণের বাণী। যে রঙের মেলা বনে বনে, যে চাঞ্চল্য মানুষের মনে মনে, কুঞ্জধ্বনি যেন তারই সংগীতময় প্রকাশ। যেন বসন্ত প্রকৃতির 'মর্মগান'। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কুহুধ্বনি শুনে অতীতের স্মৃতি ভেসে উঠছে। সেই অতীত থেকেই এই ধ্বনি নরনারীর চিত্তকে আলোড়িত করছে।

সৃষ্টিস্রোতের গতিবেগে প্রকৃতির যে নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতা, তা 'মানসী'র ক'টি কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতির ভীষণ বর্ণনায়, জড় প্রকৃতির বাস্তব রুদ্ররসের উৎসারনে 'সিন্ধু তরঙ্গ' কবিতাটি অনন্য। এখানে ঝড়ের প্রচণ্ড বেগ, বজ্রের ধ্বনি, বিদ্যুতের মুর্হুমুহু দীপ্তি, উত্তাল তরঙ্গ, তার শীর্ষের ফেনার উপর বিদ্যুৎ-আলো পড়ায় যেন প্রকৃতির 'তীক্ষ্ণ, শ্বেত-রুদ্ধ হাসি' দেখা যাচ্ছে। এককথায় প্রকৃতির এক হিংস্র ভয়াল মূর্তির জীবন্ত চিত্র। আবার 'প্রকৃতির প্রতি' কবিতায় প্রকৃতিকে বর্ণ-গন্ধ- গানে সজ্জিত মায়াবিনীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যে সবসময় মানুষের সরল প্রাণ ভোলাতে ব্যস্ত।

যে অনন্যসাধারণ প্রকৃতি-প্রীতি, যে বিশ্বাত্মবোধ পৃথিবীর জলস্থল-তরুলতা পশুপক্ষীর মধ্যে নিজেকে ব্যপ্ত করে তার সৌন্দর্য পান করতে চায়, 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় তার প্রথম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। অহল্যাকে পৃথিবীর সন্তান রূপে কল্পনা করে, পৃথিবীর মধ্যে প্রাণময়ী জননীকে অনুভব করেছেন। এও তার প্রকৃতিকে অন্যচোখে এক দেখা।

'মানসী'তে কবির এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল — বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে নিজ একাত্মতা অনুভব। এক চেতনাই তে জড়জগৎ, উদ্ভিদজগৎ হয়ে প্রাণীজগতে আগত। মানুষ তাই প্রাণী হয়েও উদ্ভিদজগতের প্রতি নাড়ীর টান অনুভব করে, কবি এই আবেগময় অনুভূতিকেই কাব্যের ঐশ্বর্য দান করেছেন। এ অনুভূতি তাঁর বিশ্ববোধেরও মূলপ্রেরণা।

'মানসী' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের নিজ দেশ সম্পর্কে মনোভাবও জানা যায়। জীর্ন কুসংস্কার ও গতানুগতিকতা বাঙালীর ব্যক্তিজীবন ও সমাজ জীবনকে পঙ্গু করে দিচ্ছে, অথচ দেশ ও সমাজ নতুন আলোকের প্রতি চোখ বুজে আছে। প্রকৃত সত্য ও মঙ্গলের পথে যাওয়ার কোন তাগিদা নেই তাদের। কবি, এই কাব্যের কিছু কবিতায় সেই স্থবির সমাজকে কশাঘাত করেছে এবং সে সঙ্গে নিজের প্রাণের বেদনাও প্রকাশ করেছেন।

'বঙ্গবীর' কবিতায় কবি দুর্বল দেহ, অধ্যয়ন সর্বস্ব, কর্মহীন অতীতের বৃথা গৌরবস্ফীত বাঙালীকে বিদ্রূপ করেছে। 'ধর্মপ্রচার' কবিতায় অর্থহীন ধর্মোন্মত্ততা ও পরধর্মে অসহিষ্ণুতাকে ব্যঙ্গ করেছেন। আবার 'বধূ' কবিতায় সাধারণ বাঙালী ঘরের বধূজীবনের নবতর পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার আয়োজনের মধ্যে বেদনা, চাপা কান্নার করুন সুর মিশি আছে। এখানে —

"ইঁটের পরে ইঁট মাঝে মানুষকীট;
নাইকো ভালবাসা নাইকো খেলা!

এক মমতাহীন আবেষ্টনের চাপে জীবনের সহজ, নির্মল স্রোত বিষাক্ত হয়ে গেছে, মানুষের মনকে বোঝার মত কেউ নে এই ধারায় কবিতার মধ্যে বাঙালীর ভীরুতা, কাপুরুষতা ও দুর্বলতার প্রতি যত না ব্যঙ্গ আছে, তার চেয়ে বেশী আছে বেদ 'দেশের উন্নতি' কবিতায় তিনি বলছেন — 'সবারে চাহে বেদনা দিতে বেদনা-ভরা প্রাণ!

বাঙালী জীবনের স্থবিরতা, সংকীর্ণতা, গতানুগতিকতা ও ক্ষুদ্রতার গন্ডী ভেঙ্গে 'দুরন্ত আশা' কবিতায় উদ্দাম, বৈচিত্র্য জীবন যাপনের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। বাঙালী সমাজকে বিদ্রুপ করে করে কবির চিত্ত নিরাশ হয়ে উঠেছে, তিনি বিদ্র হয়ে যাচ্ছেন। 'ভৈরবী রাগিনী' কবিতায় একটি কর্মহীন, অলস, আরামপ্রিয়, স্বপ্নালু জীবন থেকে কঠোর কর্মময় ও দু সংকটময় জীবনে যাত্রার জন্য সংকল্পের ইঙ্গিত আছে।

সুতরাং একদিকে যেমন 'মানসী' প্রেম ও সৌন্দর্য চেতনার পরিচায়ক, অন্যদিকে তেমনি রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী মনো আর প্রকৃতি সম্পর্কীয় ভাবনার অমূল্য স্মারক। 'মানসী' তাই রবীন্দ্রনাথের মানস-কুসুম, উল্লেখ্য এক সৃষ্টি।

.....

প্রিয় খেজুরী মহাবিদ্যালয়

— অনিতা মাইতি

চার দেওয়ালে আবদ্ধ প্রিয় এই ভবন
মহাবিদ্যালয়ের ভবন মাঠ দেখে ভরে নয়ন।
শিক্ষার পূর্ণ আলোতে আলোকিত শিক্ষালয়,
এই মোদের গর্বের খেজুরী মহাবিদ্যালয়।।
সবুজ ঘেরা মাঠ মোদের চমৎকার শিক্ষালয়ের দেওয়াল,
সকলেই করে শিক্ষালয়ের পরিপূর্ণ খেয়াল।
ক্লাস রুমের বেঞ্চে টেবিলের করা হয় যত্ন,
শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের একসাথে মনে হয় রত্ন।
সুন্দর যেমন মহাবিদ্যালয় তেমনি ইউনিফর্ম,
নিত্য-নতুন সফলতাও করছে অতিক্রম।
জাতীয় পতাকার তলায় যখন শিক্ষার্থীরা দাঁড়ায় .....
মহাবিদ্যালয়ের সৌন্দর্য তখন পূর্ণতা যে পায়।
এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায় কেউ বা রাস্তা ঘাটে,
কেউ বা অযথা বারান্দাতে হাঁটে।
অধ্যাপকেরা অতি যত্নে করে পাঠ দান,
দেয় তারা নিত্য-নতুন নানা রকম জ্ঞান.....।
দায়িত্বকে অধ্যাপকেরা করে না অবহেলা
সাধ্য মতো শিক্ষা দিয়ে অধ্যাপকেরা কাটিয়ে দেয় বেলা।
ছাত্র-ছাত্রী অধ্যাপকেরা হয়তো যাবে চলে,
মহাবিদ্যালয় নিজের মতো ঠিক রয়ে যাবে .....।
বলে দেবে সময় কার যাবার পালা
স্মৃতিগুলো থাকবে শুধু হৃদয়েতে তোলা।।

.....

স্বপ্নের দেশ

— সূর্য শেখর পাত্র,
অধ্যাপক, কালচার বিভাগ, ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট

দুচোখ আমার স্বপ্ন রঙিন
রং তুলিতে আঁকা
গ্রামের চারিদিকে পৌঁছে যেতাম
পথটা যেথায় আঁকা বাঁকা
প্রভাত বেলায় শিশির পড়ে
সবুজ বেলায় বুকের ফাঁকে
সুদূরে কোথায় পিয়ালী আছে
পাপিয়া যেথায় পিউপিউ ডাকে,
তুলোর মতো মেঘগুলো সব
আকাশ পানে ভাসে
আড়ালে তার সূর্য্যিমামা
মুচকি মুচকি হাসে
সূর্যিমামার আলোর ছটায়
সেই গান জেগে ওঠে,
কাশ ফুলের মুকুলগুলো
ফুল হয়ে সব ফোটে
জেগে উঠেই দেখি আমার
স্বপ্ন দেখা হলো শেষ,
কোথাও যেনো হারিয়ে গেলো
সেই আমার স্বপ্নের দেশ।

.....

বিরক্ত বর্ষা

— সুতপা পাত্র

বর্ষা এল আষাঢ় মাসে
জলের রাশি নিয়ে,
আকাশ হতে বারি ধারা
ঝরে ঝমঝমিয়ে,
কবির ভাষায় বর্ষাকাল
আহা দারুন খাসা।
আমার কথায় বর্ষাকাল
ঝিমুনিতেই ঠাসা,
বর্ষাকালে পুকুর নদী
দুকূল ছাপিয়ে যায়,
দারুন স্রোতে মাঝিরা হায়
হালে পানি না পায়
বর্ষাকালে বৃষ্টি যদি
একটু বেশি হয়,
ঘর বাড়ি সব ডুবে গিয়ে
ভীষণ ক্ষতি হয়।
বর্ষাকালে পোকামাকড়
বড্ড জ্বালায় আরো
বর্ষাকে রুখতে পারে
সাধ্যি নেই কারো।

.....

আজকের সমাজ

— শ্রী দিলীপকুমার দাস, শিক্ষক, বৃত্তিমূলক শাখা

হরিচরণ দাস, গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। ব্যক্তিগতভাবে হরিচরণ বাবু একজন আদর্শ শিক্ষক। নিজে শুধু সুশিক্ষিত নন, ছাত্রছাত্রীদের সুশিক্ষা দেওয়া উনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। উনি কখনো অন্যায়ের সংগে আপোশ করেননি। গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষই সম্মান করে থাকে।

হরিচরণ বাবুর একটি মাত্র সন্তান যে কলকাতায় থেকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজনে মহাবিদ্যালয়ে পাঠরত। তবে কতটা সুশিক্ষা গ্রহণ করবে এই ব্যাপারে হরিচরণবাবুর সন্দেহ থেকে গেছে।

একদিন হরিচরণবাবু তাঁর সন্তানের স্বার্থে দেখা করা ও তার অবস্থানের গতিপ্রকৃতি নিরীক্ষনের উদ্দেশ্যে কলকাতা রওনা হলেন। কলকাতায় বাস থেকে নেমে তাঁর সন্তানের হোস্টেলে যাওয়ার জন্য সামান্য পথটুকু পায়ে হেঁটেই যেতে শুরু করলেন। রাস্তার দুই পাশে ছোট ছোট গাছগুলো ছায়া দিচ্ছে এবং বেশীরভাগ গাছগুলোর নীচটা কংক্রীটের বেদী করা। বিভিন্ন গাছের নীচে ছেলে মেয়ে, মানুষজন গল্প করছে, আড্ডা দিচ্ছে। এইরকম একটি গাছের নীচে অত্যাধুনিক দুটি ছেলে ও তিনটি মেয়ে খোশ মেজাজে আড্ডা দিচ্ছে, গল্প করছে নিজেদের মধ্যে। প্রত্যেকের হাতে একটি করে সিগারেট যা দেখে হরিচরণবাবু অবাক হয়ে গেলেন। তিনি আরও লক্ষ্য করলেন, একটি মেয়ে সিগারেটের এক গাল ধোঁয়া একটি ছেলের মুখে ছেড়ে তার গায়ের উপর ঢলে পড়ছে। তাদের হাসি ঠাট্টা এককথায় হরিচরণবাবুর ভাষায় বেলেল্লাপনা এবং তাই দেখে তিনি সটান এগিয়ে গিয়ে ছেলেমেয়েদের মুখোমুখি হয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীমায় প্রতিবাদ করে বলে উঠলেন — তোমাদের এইটুকু বয়সে সিগারেট খেতে লজ্জা করছে না? লোকসমক্ষে তোমাদের এইভাবে ঢলাঢলি অর্থাৎ মেলামেশা সামাজিকভাবে কি দৃষ্টিকটু নয়? এই শুনে তো ছেলেমেয়েগুলো প্রথমে অবাক হয়ে হরিচরণবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকল। কারণ ইতিপূর্বে তারা তাদের এইরূপ মেলামেশা যা নাকি সামাজিক অবক্ষয়, তা তারা কখনো ভাবেনি এবং তারা সেটা মোটেই স্বীকার করে না। তারা হরিচরণবাবুকে ভালোকরে অবলোকন করে তাঁকে নিয়ে একটু মজা করার অভিপ্রায়ে তাঁর সংগে বিরুপ আচরণ শুরু করল। একসময় একটি মেয়ে সিগারেটের এক গাল ধোঁয়া তাঁর মুখের উপর ছেড়ে নিজেদের মধ্যে অট্টহাসিতে মশগুল হয়ে পড়ল। আদর্শ শিক্ষক হিসেবে সন্তানতুল্য ছাত্র-ছাত্রীদের এই আচরণ সহ্য করতে না পেরে একটি ছেলের গালে সপাটে চড় মেরে বসলেন যা ছেলেমেয়েরা কখনো ভাবতে পারেনি।

এরপর যা হওয়ার তাই হল - ছেলেমেয়েরা প্রবীন আদর্শবান শিক্ষকের সংগে যা ব্যবহার করল তা লিপিবদ্ধ না করে অনুভব করার অনুরোধ রইল। একটি ছেলের বাবা দাপুটে বিধায়ক হওয়ায় কিয়ৎক্ষনের মধ্যে হরিচরণবাবু এ্যারেস্ট হলেন এবং সারারাত থানার সেলে রাত্রিযাপন করে পরেরদিন কোর্টে produce করা হল। কোর্টে বিচার চলাকালীন সম্মানীয় উকিলবাবুর জেরায় হরিচরণবাবু সেই মুহূর্তে ভাবতে শুরু করলেন যে তিনি এতদিন সুশিক্ষা দানের মাধ্যমে নিজেকে সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার কারিগর মনে করা সম্পূর্ণ ভুল ছিল। উকিলবাবু তাঁর জেরায় প্রমাণ করতে চাইলেন যে তিনি একজন ভণ্ড, জোচ্চোর, কুরুচিসম্পন্ন একজন অপ্রকৃতিস্থ শিক্ষক যা বর্তমান সমাজে সম্পূর্ণভাবে অচল। বেঁচে থাকার তাঁর কোন অধিকার নেই।

মাননীয় বিচারক কিছুসময়ের জন্য কোর্ট মুলতবি ঘোষণা করলেন। হরিচরণবাবু কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে অপেক্ষা করতে থাকলেন মাননীয় বিচারকের অন্তিম রায়ের জন্য।

কিছুক্ষনের মধ্যে হরিচরণবাবুকে মাননীয় বিচারকের বিশ্রামকক্ষে ডেকে পাঠান হল। হরিচরণবাবু বলির পশুর ম মন্থর গতিতে বিচারকের বিশ্রামকক্ষে উপস্থিত হয়ে মাথা নীচু করে বিচারকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং মাননীয় বিচারকে থেকে আরও কিছু ধিক্কার শোনার অপেক্ষা করতে থাকলেন। হঠাৎ হরিচরণবাবু তাঁর দুটি অপরিশোধিত পায়ে কোমল হাতে স্পর্শে চমকে উঠে সামনে বিচারককে দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। উনি জানলেন এই বিচারক নাকি কোন এক সময় তঁ ছাত্র ছিলেন।

এতক্ষণ যে ঘটনা ঘটেনি এখন তা ঘটল। হরিচরণবাবুর চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। হরিচরণবা এতক্ষন যেন দমবন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। কিন্তু একটা দমকা হাওয়া সব বেকসুর ছাড়া পেয়ে কে থেকে বেরিয়ে এলেন এবং উনি ভাবলেন যেন উনার পুর্নজন্ম হল। উনি নতুনভাবে জীবন পেয়ে আজকের সমাজে প্রতিচ্ছবি সম্যকউপলব্ধি করলেন।

.....

যখন কোন ব্যক্তির কাছে মান, যশ ও অর্থ
এই তিনটি জিনিসই থাকে তখন সে
মানুষকে মানুষ বলে গ্রাহ্য করে না।
তখন সে ভুলে যায় যে তার থেকেও শক্তিশালী
কেউ আছে এই পৃথিবীতে
আর সেটা হল 'সময়'

— ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

"শরৎ"

– সুশীল বেরা,
অধ্যাপক, অ্যাকোয়া কালচার বিভাগ

ওই আসছে দুলে দুলে শরৎ কাশের হাওয়ায়
ভোরের শিশিরে ঘাসের ডগা ভরে যায়।
টুকরো টুকরো মেঘপুঞ্জ ভেসে যায় ওই গগনে
ভুবন সারা প্লাবিত হয় রাঙা রবির বিচরণে।
প্রভাতকালে শিউলি এল ভরা শিউলি ফুলে
কাশবাগান ছেয়ে যায় নদীর ওই দুকূলে।
ঢাকের আওয়াজ কাঁসর ঘন্টা দূর থেকে যায় শোনা
দুর্গোপূজোয় মণ্ডপে হয় নানা মানুষের আনাগোনা।
ঢাকের তালে ধুনোর গন্ধে নাচে সবার মন
নতুন নতুন পোষাক পরে মায়ের দরশন।
চারটি দিনের দুর্গাপূজো মন-মাতালে খুশি
দশমির দিন বিসর্জনে হই আমরা দুঃখী।
রঙবেরঙের ফুলের গন্ধ ভরে যায় পরিবেশে
সু-স্বাদু ফলের গন্ধে জিভ যায় জলে ভেসে।
নানা পাখির নানা কুজন মিষ্টি ভরা সুর
শোনা যায় ওই রোদ দুপুরে দূর বহুদূর।
আগ্রের শিখায় হেমন্ত আসে শরৎ যায় চলে
আসবে আবার শরৎ কবে সাজবে ফুলে ফুলে।

.....

"বাংলা"

– সুশান্ত মণ্ডল

বাংলা কোন অবুঝ শিশু নয়,
যে শুনবে পিতার শাসন।
বাংলা কোনো উপলক্ষ্য নয়,
যা সেমিনারের দীর্ঘ ভাষণ।
বাংলা বাঁচে লোকের মুখে,
বাংলা থাকে বাঙালির বুকে।
বাংলা শুধু ভক্তি শ্রদ্ধা পায়,
তাকে আটকায় কোন উজবুকে।
বাংলা গান শুনছি আর
বলছি সেটা বাংলা গান নয়।
বাংলাকে চিনতে অস্বীকার
এটা কি তার অপমান নয়?
বাংলা যেন কখনো না হয়
যোগাযোগের প্রতিবন্ধক।
মাঝে মাঝে কথা বদলে,
সুরে সুরে কথা হোক।
পৃথিবীকে চিনতে চাইছে,
আজ এ বাংলা ভাষা।
তরুণের রক্তে রাঙানো থাক,
বাঙালির গর্ব বাঙালির ভালোবাসা।

.....

"গোধূলী লগ্ন"

– নৈর্মিষা প্রামাণিক, প্রাক্তন ছাত্রী

বহুকালে ধরে আমি গুছিয়ে রেখেছিলাম,
এক াকাশ ধরার ক্ষমতা সম্পূর্ণ এক আয়না।
আজ গোধূলী লগ্নের লালচে দাগে,
তার টুকরো টুকরো খণ্ড মাটি বুক চিরে
তন্দ্রাচ্ছন্ন ঘুমে মগ্ন,
অবিভক্ত আকাশ এই প্রথম পৃথিবী ছুঁলো
খণ্ডে খণ্ডে,
বৃন্ত ছাড়া গোলাপের পাঁপড়িগুলো হারিয়ে গেলো,
বৃহৎ আয়তক্ষেত্রাকার এক মেলার ভিড়ে।
তবুও ফুটে উঠলো ফুল,
জ্বলে উঠলো তারা,
তুমিও জানো,
আমিও আনি,
সব ডাঙ্গার আঘাত ঝরা শ্রাবন হলেও
নদী কিন্তু সমতা রেখেই বয়ে যায়.....।

.....

"জাগতিক"

– মধুমিতা মণ্ডল
পঞ্চম পাঠমালা, বাংলা বিভাগ

নিশি নাহি আর, উগে প্রভাকর
কলতানে বিহঙ্গমা বিভাবরী।
কুহেলিকা ময়, জগৎ আলয়
টুপটাপ পড়ে শিশিরি।
বহুদূর গাঁয়ে জীর্ন কুটিরে
শীতার্ত বুড়োবুড়ি।
পঞ্চমী ঋতু, গায়ে নেই কিছু
তাহাদের পুত্র আনিয়া ছিল বৌমার দুইগাছি
স্বর্ণ চুড়ি।
পুত্র তাহার বিলেত ফেরত, নামকরা
ব্যারিস্টার
তিন তলা বাড়ি রংবাহারি, তবে জায়গা
নেই মাতা পিতার।
তাই ভাবিলাম, ওগো ভগবান
কেন এমন পুত্র দিলে?
এর চেয়ে শ্রেয় নিঃসন্তান হলে।।

.....

মতি

— মধুমিতা মণ্ডল

হারান সেকের গোয়ালের পশ্চাতে একটি সারমেয় পাঁচটি শাবকের জন্ম দিয়াছে। সমস্ত কটা শাবকই বেশ নিটোল এবং হৃষ্টপুষ্ট, শাবকদের রেখে সারমেয়টি যখন বেড়াইতে যাইত, তখন শাবক গুলি পরস্পর খেলা করিত। এ ওর কান কামড়াইয়া ধরিত, সে তার লেজ কামড়াইয়া ধরিত, চুপি চুপি বাহিরে আসিত, আবার ছুটিয়া পলাইত ভিতরে। হারান এ সমস্ত কান্ড কারখানা লক্ষ করিয়া বেশ আমোদ পাইত। নিম্নবিত্ত হারান তাহার স্ত্রী নাদিরাকে লইয়া মোটামুটি সাচ্ছন্দেই দিন কাটিত তাহাদের। পাঁচটি শাবকের মধ্যে একটিকে হারানোর বেশ মনে ধরিয়াছে, শাবকটি খুবই প্রাণচ্ছল। কি জানি কি হয়িাছে শাবকটি হারানের খুব গা ঘেঁষা হইয়া উঠিয়াছে, হারান যেখানে যাইত শাবকটি তাহার পিছন পিছন যাইত। হারান যখন দাওয়ায় সেলাইয়ের মেশিন লইয়া বসিত, শাবকটি তাহার উঠানে একটি ছোট কাপড় লইয়া খেলা করিত, কখনো মুখে লাপাইয়া লইত, কখনো দাঁত দিয়া টানিত, ঠিক এক বৎসরের শিশুর মতোই তাহার আচরণ। নিঃসন্তান হারান শাবকটিকে আদর করিয়া নাম দিয়াছে মতি। মতি যেমন দূরন্ত তেমনি শান্ত, মুখশ্রী খুবই মায়াপূর্ণ, কর্ণদোয়া মাথার গহনা নিবেশ অতিক্রম করিয়াছে। ধীরে ধীরে মতি হারানের হৃদয়ের নিকটবর্তী স্থান অধিকার করিয়া পরিবারের একজন সদস্য হইয়া উঠিল। খাইতে, ঘুমাইতে, যাবতীয় কর্মে মতি এখন হারানের বাহন।

হারান গিয়াছিল ফজলুল সেকের বাড়িতে কাষ্ঠ ছেদন করিতে। ফিরিতে বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছে। বাড়ি ফিরিলে মতি হারানে গায়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া জিভ দিয়ে চাটিতে লাগিল, হারান বুঝিতে পারিল মতির এখনো খাওয়া হয়নি। রাগে হারান চিৎকার করিয়া নাদিরাকে হাকিল, নাদিরা আসিয়া কহিল জি, কি কও? হারান কহিল তুই মতিকে খাইতে দিস নাই? আমার ভিটায় দানা পানির অভাব পড়িয়াছে? নাদিরা চুপ করিয়া রহিল, স্বামীর গোসা সে জানিত তো। আমার মোতিকে খাবার দিলে কি তোর আহহার অন্ন খশিয়া যাইতেছে? বলিয়া নাদিরাকে মারিতে উদ্যত হইয়া থামিয়া গেল। নাদিরা চোখ মুছিতে মুছিতে বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল।

মতি এখন বড়ো হইয়াছে। ও যেন মানুষের কথা বুঝিতে পারিত, হারান খাওয়ার সময় তাহাকে পাশে বসিতে কহিলে সে বাধ্য ছেলের মতো বসিয়া পড়িত। হারান কোনোদিনই মতিকে বাঁধিয়া রাখিত না, সে নিজেই ও পাড়ায় ও পাড়ায় ঘুরিত আবার ফিরিয়া আসিত। হঠা? একবার পরপর তিনদিন মতি বাড়ি ফিরিল না, হারান মতিকে খুঁজিতে খুঁজিতে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। নানান দুশ্চিন্তা তার মাথায় ঘুরিতে লাগিল, রাস্তা পারাপারের সময় কোন গাড়ি তাহাকে পিসিয়া দিয়ে চলিয়া গেল। কেউ কি তাকে মারিয়া ফেলিল। নাওয়া খাওয়া কাজকর্মে ভুলিয়া পুরা গ্রাম খুঁজিল, পাশের আরও দুটো গ্রাম খুঁজিল, পাশের আরও দুটো গ্রাম খুঁজিল, অবশেষে মতিকে পাইল পূর্ব পাড়ার ঢালাই রাস্তার ধারে। একটি সারমেয়র সহিত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, একটি ছোট্ট গুমটি দোকানের পাশে। হারান তাহাকে পাইয়া কোনরকমে বাড়ি লইয়া আসিল। মতি ভারী আদর কাতুরে তার ভাগ্যের আদর সে আর কাউকে লইতে ঠিক পছন্দ করিত না তাই সে বোস বাড়ির কুকুরের সহিত মারামারি করিয়া মুখ চোখ ছিঁড়িয়া আসিয়াছ। কারণ নাদিরা আজ খাবার দেবার সময়, তাহার ভাগ উহাকেও দিয়াছে। তার এই অবস্থা দেখিয়া হারানের মাথায় বজ্র পড়িল সে মতিকে বকিয়া বকিয়া ওষুধ লাগাইয়া দিল। পরে আবার মতি মারামারি করিয়া আসিল। সুখী হারানকে দেখিয়া ঈর্ষায় কিছু আড়শী পড়শী জ্বলিয়া মিথ্যা নালিশ করিতে আরম্ভ করিল। মকু সেক বলিল, মোছোলমানের ঘরে এই নাপাক জন্তু রাখিলে আল্লাহ ফেরেস্তা টিপের ধারে কাছে ও আসবে না। দিন দিন লোকের নালিশ আরও বাড়িতে লাগিল।

আজ ও বাড়ির মাছ চুরি করিয়াছে, কাল সে বাড়ির ভাতের হাড়িতে মুখ দিয়াছে, বাস্তবে মতি কিন্তু তেমন প্রকৃতির নয় য
তাহারা দাবি করিতেছে। তাহার সামনে কতবার হারানের বউ খাবার রান্না করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, মাছ কুটিয়া কেটে
গিয়েছে, কোনদিন সে ছুঁইয়া দেখেনাই বরং পাহারা দিয়েছে। হারান কাঠ কাটিতে গিয়াছিল সেই কাকভোরে, বাড়ি ফিরি
শুনিল মতি পুনরায় বোস বাড়ির কুকুরের সঙ্গে মারামারি করিয়াছে, তাই ভুবন বোস মতিকে সজোরে বাঁশ দিয়া প্র
করিয়াছে তিনবার। শুনিয়া হারানের রক্ত নাচিয়া উঠিলো, না না সে আর সহ্য করিতে পারিবে না। দু বছরের সে ক
মতিকে প্রহার করে নাই, সারা জীবনে সে কাহারো কটু কথার ধার ধারে নাই, এত কটুক্তি সে সহ্য করিতে না পারিয়া
মেন ঠিক করিল সে মতিকে বিষ দিয়া মারিবে। বিকাল চারটায় যখন মতি বাড়ি ফিরল তখন তার মুখ হইতে রক্ত ঝ
ঝরিয়া পড়িতেছে, ঘাড় ফুলিয়া ঢোল হইয়া আছে। ক্ষোভে যন্ত্রণায় তাহার চক্ষে আর সেই দৃশ্য সহ্য হইল না, সঙ্গে স
ঘরের ভেতর হইতে এক থালা বিষ মিশ্রিত ভাত আনিয়ে মতির সামনে থালাটা রাখিয়া দিল। মতি হারানের কাছে আ
তাহার পা জড়াইয়া জিভ দিয়া চাটিল, কোলের কাছে শুইয়া ভাত খাইতে আরম্ভ করিল। ভাত খাইবার সঙ্গে সঙ্গে মতির
হইতে গরল বাহির হইয়া ছটকাইতে লাগিল, ছটফট করিতে করিতে ধীরে ধীরে মতি শেষে স্থির হইয়া গেল। হারান
খানে বসিয়া পাথর হইয়া গেল।

.....

"মা মানে তো"

— শুভ্রা জানা
পঞ্চম পাঠমালা, বাংলা বিভাগ

মা মানে তো মায়ার বাঁধন
মায়ের স্পর্শ জুড়িয়া বুক।
মা-ই এনে দেয় বক্ষ জুড়ে স্নিগ্ধ মধুর স্বর্গ সুখ
মা মানে তো মানবতা প্রেম মমতার শিক্ষালয়
মায়ের আশিষ মাথায় রাখিস চলার পথে হবেই জয়।
মাই তো স্নেহের স্পর্শ দিয়ে মধুর করে সৃষ্টিকে
বিশ্ব জুড়ে মা-ই তো বাঁচায় সভ্যতা আর বৃষ্টিকে।
মাকে দিয়ো প্রাপ্য আসন শ্রদ্ধায় আর সম্মানে
মানবতা উড়বে নিশান পাহাড় চূড়ায় আসমানে।।

.....

"ভাবনা"

– শোভনা দাস
পঞ্চম পাঠমালা, বাংলা বিভাগ

আমার ভাবনা আমি ভাবি তোমার চিন্তা কিসের
আমি বেজায় নাক ডাকি ঘুম আসে না ছেলের।
বিয়ে পাগলা বুড়ো আমার রঙ্গ দেখে বাঁচি,
দাঁতগুলো সব ঝরে পড়েছে চেহারাটা আস্ত খাঁটি।
পাখি সব উড়ে যায় মেঘ ও তাই করে,
চিন্তা শুধু একটাই বৃষ্টি কোথা থেকে ঝরে।
দেশের কথা দশের কথা ভাবছে নাকি সবাই,
তারাই আবার খাচ্ছে দেশ এটা ছিল হওয়াই।
এই মেয়েটা চলে যায় খাটো পোশাক পরে,
আগে পিছে সবাই তাকায় বড়ো বড়ো চোখ করে
চিকেন কসা মাটন কসা স্বাধের রান্না চাই,
তাদেরও তো প্রাণ আছে আমরা বেশ খাই।
পড়া নাকি হয়েছে সহজ বাপ কাকারা বলে,
নানা রকম কথা বলে ভুলায় নানা ছলে।
গল্পের গরু গাছে ওঠে সত্যি যদি হতো,
গাছের তবে ফল ফুল সব মাটিতে হত শত শত।
গায়ক এখন গাইছে গান থাকছে না কোনো মানে,
তাও সবাই শুনছে গান থাকছে না কোনো মানে।
হাওয়া যদি খাওয়া যেত বেঁচে যেত টাকা,
মাটির বাড়ি ভেঙ্গে শত হত অট্টালিকা।
পড়াশোনা করলে তবে চাকরি পাবে সবাই,
মুর্করাই করছে দেখছি হাজার শিক্ষককে জবাই।
হাজারটা স্বপ্ন দেখে পূরণ করবে কোনটা,
আজ ঘুমালে কাল সকলের বেজে যায় ঘণ্টা।
ভাবনার মধ্যে জীবন চলে জীবনের মধ্যে আবনা,
অনেক কিছুই আসবে যাবে নিয়মের ধারণা।

.....

Best Friend

— সঞ্চিতা বেরা

আমি সঞ্চিতা। আমি ক্লাস ৮ পড়ি, আমার গ্রাম খুব ভালো লাগে। এই জন্য আমি মামা বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করি। গ্রামে থাকার মজাটা সম্পূর্ণ আলাদা। খোলা হাওয়া। বড়ো বড়ো মাঠ, মাঠে সবুজ ঘাসে ভরা শুধু এই জন্য ভালো লাগে তা না, আমার প্রিয় মানুষ দাদু দিদা আমার জীবন, দিদাকে ছাড়া আমি ঘুমাতে পারিনা। সেই যাই হোক এটা হল আমার ভালো লাগা ভালোই ছিলাম। একদিন হঠাৎ আমার দাদু আমাকে মা বাবার কাছে পাঠিয়ে দিল বলল তুই ওখানে বাবার সাথে থাকবি। ঠিক আছে থাকব প্রথমে ভাবছিলাম শহরে থাকব ভালো স্কুলে পড়ব ভালোই থাকব। তারপর মা আমাকে একটা ভালো গার্লস স্কুলে ভর্তি করেদিল। বেশ বড়ো স্কুল, অনেক মেয়ে। তারপর আমাকে মা স্কুলে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল আমার হঠাৎ কেমন যেন হতে লাগল। কান্না পেয়ে গেল প্রচুর কাঁদছিলাম। কিন্তু কেন বুঝতে পারছিলাম। ম্যাম কাছে এসে বলল তুমি ক্লাস ৯ পড় এত বড়ো মেয়ে হয়ে কাঁদছো। ম্যাম অনেক কথা বলার পর আমি চুপ হয়ে গেলাম। দূর থেকে ৫ ফুট লম্বা একটা মেয়ে দেখতে বেশ ভালো, ম্যাম তাকে বলল সঞ্চিতা তুমি একে নিয়ে যাও তোমাদের ক্লাসে বসবে - আমি ভাবিনি পরে এই আমার বেস্ট ফ্রেণ্ড হবে। সে যাই হোক আমি গিয়ে বসলাম। সঞ্চিতার কাছে বসিনি লাস্ট একটা কোনের বেঞ্চে বসলাম, সেদিন কোনো রকম ক্লাস হল। টিফিন টাইমে সবাই সবার টিফিন নিয়ে বসে আড্ডা দিচ্ছে এক সাথে ভাগ করে টিফিন খাচ্ছে। তখন আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল কাঁদতে লাগলাম, পেছন থেকে কে একজন কাঁধে হাত দিয়ে ডাকলো। আমি মুখ তুলে দেখলাম ওই ৫ফুট লম্বা মেয়েটা। আমার কাছে এসে বসল এই তুই কি নিয়ে এসেছিস টিফিনে, আমি বললাম, চাউমিন, ও একা খাবি আমাদের দিবি না। আমার টিফিনটা নিয়ে একটু তুলে নিল, ওর থেকে আমাকে দিল টিফিন। তারপর জিজ্ঞাসা করল, এই তুই কোথায় থাকিস, তুই কাঁদিস কেন এত, বাচ্চা মেয়ে নাকি তুই? হাসতে লাগল সবাই ওর কথা শুনে খুব খারাপ লাগছিল। ওর কথাগুলো প্রথম দিন ভালো কাটেনি স্কুলে। তাই ৪-৫ দিন স্কুলে যাইনি। মা ও বেশি কিছু বলেনি, বুঝতে পেরে ছিল আমার কষ্ট হচ্ছে এখানে। কিছুদিন পর মার ফোনে একটা ফোন আসে। ফোনটা আমার জন্য ছিল, কিরে সঞ্চিতা তুই স্কুল আসছিস না কেন? আমি বললাম শরীরটা ভালো নেই তাই জন্য। ও, ওষুধ খেয়েছিস? হ্যাঁ খেয়েছি কাল স্কুলে ছুটি পড়বে। পূজোর জন্য নতুন ড্রেস পরে আসবি, আমি বললাম ঠিক আছে। কেটে গেল ফোনটা, আমি জানতাম আমি যাব না স্কুলে, কিন্তু হঠাৎ কি মনে হলো চলে গেলাম, গিয়ে দেখি সবাই খুব সুন্দর শাড়ি পরে এসেছে, আমিও পরেছি, কিন্তু ওদের মতো এত ভালো না, আমি আমার এই এক কোনে লাস্ট বেঞ্চে বসলাম। যাতে কেউ দেখতে না পায় ও ঠিক এসে হাজির চল চল তোকে সাজিয়ে দেবে। বাথরুমে গিয়ে খুব সুন্দর করে শাড়ি পরিয়ে দিল। তারপর আমাকে ওদের বেঞ্চে বসালো। সবাইকে বলল এই আমার কাছে বসবে আজ থেকে। সঞ্চিতা সাথে আর একটা মেয়ে ছিল ঈশিকা মেয়েটা খুব ভালো কথা বলে। সবাই হাসায় আমিও হাসছিলাম ওর কথায়। ওকে ক্লাসে সব মেয়েরা হিসু বলতো আমি ঈশিকা বলতে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল তুই কেলেটা। বেশ ভালো লাগছিল ওইদিন এক সেকেণ্ডে ও আমাকে ছাড়েনি। যাই হোক তারপর এক সঙ্গে পূজোতে ঘুরলাম। একসঙ্গে পড়তে যেতাম। সঞ্চিতা খুব হাসি খুশি মেয়ে আমি ভাবতাম তার কোন প্রবলেম নেই। কিন্তু না, সঞ্চিতা স্কুলে অন্য রকম বাড়িতে একটা অন্যরকম থাকত কারণ তার বাবা খুব রাগি ছিল। যাইহোক আস্তে আস্তে কখন যে সে আমার বেস্ট ফ্রেণ্ড হয়ে গেল বুঝতে পারিনি সঞ্চিতার হাতে মোমো সুপার। রবিবার ওর বাবা না থাকলে আমরা চলে যেতাম মোমো খেতে। বাইরে ঘুরতে দেখলে ম্যাম আমাদের একজনকে দেখলে আর একজনকে খুঁজতো এতটা আমাদের বন্ধুত্ব ছিল। তারপর আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম এক

স্কুলে ভর্তি হবো। ভর্তি ও হয়ে গেলাম ১১, ১২ খুব ভালোই কাটল। ১২ ক্লাসে আমরা এক কলেজে ভর্তি হব, একসঙ্গে থাক আমরাতো এটাও ভেবে ছিলাম এক বাড়িতে বিয়ে করবো। ও বড়জা হবে আমার, কিন্তু ১২ পর যখন ফাইনাল পরীক্ষা হল বাড়িতে যখন বলল অন্য কলেজে গিয়ে ভর্তি করবে আমি না বলে দিয়েছি। কিন্তু হঠাৎ কি হলো আমি অন্য অনেক দুরে কলেজে ভর্তি হলাম হওয়ার দুই দিন পর ওকে ফোন করে বলার পর ও ফোন ধরে কাঁদতে লাগল। আমি ওই ফাস্ট ওকে কাঁদতে দেখলাম। যাই হোক মেনে নিলাম বাবা মার কথা ও মেনে নিল। রোজ ফোন করত, ও আমিও করতাম ১ থেকে ২ ঘণ্টা কথা হত রোজ। লাস্ট এই কথাই হতো ভালো লাগছে না, তুই কবে আসবি। আমার কলেজে আস্তে আস্তে চাপ বাড়তে লাগল, ফোন ও ঠিক টাইমে করত, কিন্তু ২ঘণ্টা আর কথা হত না। পর পর ও ফোন করা বন্ধ করে দিল। প্রত্যেক দিনের জায়গায় সপ্তাহে একবার, দুইবার যদিও দোষ আমার ছিল। আমি সময় দিতে পারতাম না। হঠাৎ কি হল ১ মাস হলো ও আর ফোন করলো না আমি ভাবলাম ওর কলেজে হয়ত খুব চাপ পড়েছে। পরে জানতে পারি অন্য বন্ধুদের কাছ থেকে, আমি ওকে ভুলে গেছি। আমি নাকি অন্য একটা বেস্ট ফ্রেন্ড করে নিয়েছি। কষ্ট হয়েছিল সেদিন কারণ ও আমার ব্যস্ত হওয়ার কারণ বুঝলো না । ও আরো আমার মা বাবাকে দায়ি করেছে আমাদের আলাদা হওয়ার জন্য। যাই হোক আজ ৩ বছর হয়ে গেল ও ফোন করেনি আমিও করিনি whatsapp রোজ online story দেখে, আমিও দেখি কিন্তু কোন রিয়াক্ট করিনা। আমি শুধু বলতে চাই তুই এখনও আমার বেস্ট ফ্রেন্ড আছিস।

.....

যখন আপনি ব্যস্ত থাকেন
তখন সব কিছুই সহজ বলে মনে হয়
কিন্তু অলস হলে
কোনো কিছুই সহজ বলে মনে হয় না।
– স্বামী বিবেকানন্দ

ভাবনার বৃত্ত

বিমল মণ্ডল
প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, খেজুরী কলেজ

" যাবে কোথায়?"-
এইটুকু শুনে তুমি এত রেগে গিয়েছিলে
যেন সারা শহরের রোদ পেরিয়ে
চোখ মুখ লাল করে ট্রেনে ফিরছিলে
আমি কিন্তু অত কিছু ভেবে বলিনি
দেখতে না পেয়ে মন বলে ফেলেছিল
যেভাবে একটি চারাগাছ অবলম্বন ধরে বাঁচতে চেয়েছিল
সেইভাবে আমি তোমাকে দেখতে চেয়েছিলাম
সকালের সূর্য যখন পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে
মেঘলাকাশে সারা শরীর হিম হয়ে যাচ্ছিল
আমি অস্থির হয়ে মাথাটায় বারবার যন্ত্রনা অনুভব করছিলাম
আমাকে যখন তোমার বন্ধুদের মাঝে
অপমান হতে দেখে উদাসিন হও
আবার কেউ কেউ আমাকে নিয়ে
অশ্লীলতার মজার গল্প বানায়
তখনও হাততালি দাও বন্ধুর সাথে
অবাক হয়ে তোমাকে ভাবছিলাম
সেই 'তুমি'! একদিন সমুদ্র সৈকতে বসে
একান্ত নিজের একাকিত্বের গল্প বলেছিলে
আমার চোখে চোখ রেখে চোখের জলে শপথ নিয়েছিলে
আমাকে পেয়ে সব কিছু ভুলে যেতে চেয়েছিলে
জ্যোৎস্নারাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছিলে
আমিও গোটা জীবনের অধ্যায়গুলোতে
হারিয়ে যাওয়া স্বপ্ন খুঁজেছিলাম কিন্তু কি এমন হল-
আমার প্রশ্নগুলো সরিয়ে এড়িয়ে যাওয়া ?
হয়তো আমারই ছিল ভুল! যা কিছু দোষ আমারই
তোমার ভালো ও মন্দের খবর নিতে গিয়ে
তোমার থেকে কয়েক ক্রোশ সরে গেলাম শুধুমাত্র একটা জিজ্ঞাসায়
তুমি এভাবে যতবার আমাকে অন্ধকারে রাখতে চাও
আমি ঠিক ততবারই ভোরের অপেক্ষায় থাকবো।

খেজুরী কলেজ

বারাতলা, পূর্ব মেদিনীপুর

College Website: https://khejuricollege.org/

স্নাতক শ্রেণীর মূল পাঠ্য বিষয় সমূহ

	সাম্মানিক বিষয়	সাধারণ বিষয়
কলা বিভাগ	বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত, ইতিহাস, শিক্ষা বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা	বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা, শিক্ষা বিজ্ঞান, শারীরশিক্ষা, সংগীত, NSS, ডিফেন্স স্টাডিজ
বিজ্ঞান বিভাগ	Aquaculture Management, প্রাণীবিদ্যা, ভূগোল	উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, নৃ-বিদ্যা, ভূগোল